অশ্রুসজল লালকেল্লা

অন্তর্ভারতীয় পুস্তকমালা

অশ্রুসজল লালকেল্লা

খাজা হসন নিজামী

অনুবাদ

প্রবোধকুমার মজুমদার

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

1984 (শক 1906)
দ্বিতীয় মুদ্রণ : 1992 (শক 1913)

Original Title : Begmat Ke Aansu (*Urdu*)
Bengali Translation : Ashrusajal Lalkella
মূল্য : 10.00 টাকা
নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5, গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি-110016 কর্তৃক প্রকাশিত ।

ভূমিকা

শমসুল উলেমা (বিদ্যানাদিত্য) খোয়াজা হসন নিজামী দেহলবী জন্মগ্রহণ করেন 1880 খ্রীষ্টাব্দে এবং তাঁর মৃত্যু হয় দেশ স্বাধীন হওয়ার পর 1955-তে। আমার ছাত্রজীবনে এবং তাঁর মৃত্যুর কয়েকমাস আগেও তাঁকে আমি দেখেছি। বেশ-ভূষা তাঁর একই ধরনের ছিল—গেরুয়া লম্বা জোব্বা, ফকিরদের মত দোপাট্টা, সোফিয়ানা টুপি, লম্বা ঢেউতোলা চুল, আকর্ষণীয় চোখ, সম্মোহক কথাবার্তা আর বাণী যেন অমৃত সমান।

খোয়াজা হসন নিজামী পাঁচশোর বেশী বই লিখেছেন যার ভাষা ও শৈলী উর্দুতে অদ্বিতীয়। দিল্লীর চলতি ভাষায় লেখা তাঁর ছোট ছোট বাক্যগুলি মনে রেখে যায় গভীর ছাপ আর চোখের সামনে তিনি যেন ছবি এঁকে দেন। ভাষার এই সরলতা, সহজতা ও স্বচ্ছন্দতার জন্যই তাঁকে 'মুসব্বিরে ফিৎরৎ' (প্রকৃতির পটুয়া) বলা হয়।

খোয়াজা হসন নিজামীর রচনাশৈলীর উপর গভীর ছাপ পড়েছে আব্দুল হলীম শরর (1860-1926) ও মুহম্মদ হুসেন আজাদের (1830-1910)। তাঁর গদ্যে আছে চটকদার বাক্‌পদ্ধতি এবং তিনি তাঁর ভারতীয় ভিত্তির বিষয়ে অনভিজ্ঞ নন। তাতে রঙ্গরসের মজাও আছে, চিমটি ও সুড়সুড়িও আছে তবে ব্যথা ও সংবেদনশীলতার কোনো তুলনাই নেই।

খোয়াজা হসন নিজামী উর্দু শিখেছিলেন সহপাঠীদের ও নিপীড়িত শাহজাদাদের সঙ্গে যাঁরা সিপাহী বিদ্রোহের পরে প্রচুর সংখ্যায় দিল্লীর বস্তী হজরৎ নিজামুদ্দীন ও কুচা চেলানে বাস করতেন। তাঁদের সঙ্গে থাকার দরুন খোয়াজা হসন নিজামীর বুকে শাহজাদাদের প্রতি সহানুভূতি ও স্নেহ অংকুরিত হয়ে ওঠে। এই সমস্ত বিপন্ন পরিবারে মেলামেশা করে তিনি তাদের অবস্থার বিষয়ে কয়েকটি বই লেখেন যা সারা দেশে খুবই লোকপ্রিয় হয়। এদের মধ্যে 'বেগমাৎ কে আঁসু' সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বই যাতে 1857-র বিদ্রোহের অনেক সত্য-কাহিনী আছে এবং সেই বই থেকে নির্বাচিত কিছু গল্প এই সংকলনে গ্রথিত।

মুল্লা ওয়াহদী বলেন যে একবার খোয়াজা হসন নিজামীর শক্ত অসুখ হয়। তাঁর মা তাঁকে একজন দরবেশের কাছে পাঠালেন যিনি শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জফরের নিকট আত্মীয়। সেই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি এঁর গলায় 'নাদে আলী'-র (হজরৎ আলীর দুঃখ নিবারক মন্ত্র) নক্‌শা এঁকে তাবিজের মতন পরিয়ে দিলেন। মা গর্বিতভাবে বললেন, "আমার বাছার জন্য হিন্দুস্থানের বাদশা নাদে আলীর নক্‌শা দিয়েছেন।" 'বাদশা' শব্দ

উচ্চারণ করা মাত্রই মার চোখে জল এল। খোয়াজা সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "মা, আপনি কাঁদছেন কেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "বাছা, এখন তিনি আর বাদশা নেই। ইংরেজরা তাঁর সিংহাসন-মুকুট সবই কেড়ে নিয়েছে।"

খোয়াজা সাহেব বলেন যে এই ঘটনা শাহজাদাদের প্রতি তাঁর মনে সহানুভূতির এমন বীজ বপন করে যে 1922 সালে যে সময় তিনি মদিনা-এ-মুনব্বরা গিয়েছিলেন সে সময় তিনি তাঁদের জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করেছিলেন, বলেছিলেন হে দুই জাহানের সরদার, আমি দিল্লীর বরবাদ শাহজাদাদের নাতা-ও-বুকা (চিৎকার-ক্রন্দন) পেশ করছি। তারা মুকুট ও সিংহাসনের জন্য কাঁদে না। শুকনো রুটির টুকরো ও শরীর ঢাকার মোটা কাপড়ের দরকার তাদের। তাদের অপমান ও অপযশের সীমা-পরিসীমা নেই। এবার খতাপোশ, পরোয়ার দিগারের (ভুলকে ভুলিয়ে দেওয়া পালন কর্তা) কাছ থেকে তাদের ক্ষমা পাইয়ে দিন।"

1911 সালে হ'ল দিল্লী দরবার। তাতে একটি প্রোগ্রাম ছিল পণ্ডিত ও বিদ্বানদের দ্বারা অভিবাদন। সম্রাট পঞ্চম জর্জ সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে বসেছিলেন লালকেল্লার ঝরোখায় এবং কেল্লার প্রাচীরের নিচে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মনেতারা সম্মিলিত হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন। খোয়াজা হসন নিজামীকেও ডাকানো হয়। তিনি বাড়িতে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন এবং এই অনুষ্ঠানে যোগদান করলেন না। বললেন, "যেখানে শাজাহান ও তাঁর বংশধরেরা দর্শন দিতেন সেখানে পঞ্চম জর্জ অধিষ্ঠিত হবেন এ আমি দেখতে পারব না। আর লেপের আনন্দ দরবারের চেয়েও বেশী।"

এ তো ইংরেজদের সময়ের কথা। স্বাধীনতার পর লাল কেল্লায় সর্বসাধারণ মুশায়রা (কবি সম্মেলন) হয় এবং পণ্ডিত কয়ফী যখন তাঁকে যেতে বলেন তখন তিনি বলে পাঠান, আমার দ্বারা কিলা-এ-মুঅল্লার (উত্তুঙ্গ কেল্লা) এই অনাদর দেখা সম্ভব নয়।

খোয়াজা হসন নিজামীর 'বেগমাৎ কে আঁসু' নামক বইটি সর্বপ্রথম 'গদরে দিল্লীকে অফসানে' নামে প্রকাশিত হয়েছিল এবং কয়েকবার বাজেয়াপ্ত হয় বইটা। তারপর এই বইয়ের চোদ্দটি সংস্করণ বেরিয়েছে। এর কিছু অংশ রেডিওতে প্রচারিত হয়েছে। কিছু গল্প হিন্দী ও গুজরাতীতে অনূদিত হয়েছে।

1857-র বিদ্রোহে দিল্লীর রাজপরিবারকে কি না পোয়াতে হয়েছে? এই দুঃখ ও বেদনার কাহিনী হসন নিজামী এমন সংবেদনাপূর্ণ শৈলীতে এঁকেছেন যে পড়তে পড়তে চোখের জল বাঁধ মানে না। বিদ্রোহের বিষয়ে এই বাছাই করা গল্পের সংকলন তাঁর মূল নামে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট প্রকাশিত করছে। আশা করা যায় স্বাধীন ভারতে এ বই আগেকার চেয়েও অধিক আগ্রহ নিয়ে পড়া হবে।

—খোয়াজা আহমদ ফারুকী

সূচীপত্র

1. কুলসুম জমানী বেগম

একটি নিরুপায় দরবেশনীর বিপন্ন অবস্থার সাচ্চা কাহিনী এটি যাঁর উপর দিয়ে যুগবদলের ঝাপটা বয়ে গিয়েছিল। তাঁর নাম ছিল কুলসুম জমানী বেগম। ইনি ছিলেন দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট আবু জফর বাহাদুরশার আদুরে মেয়ে।

কয়েক বছর হল তিনি মারা গেছেন। কয়েকবার আমি নিজে শাহজাদী সাহেবার মুখে তাঁর অবস্থার কথা শুনেছি কেননা আমাদের শ্রদ্ধেয় নিজামুদ্দীন আউলিয়া মহবুবে ইলাহীর (প্রভুর প্রিয়) প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা। সেজন্য প্রায়ই তিনি সেখানে আসতেন এবং করুণ কাহিনী শোনার সুযোগ পেয়ে যেতাম আমি। নিচে যতগুলি ঘটনা বলা হয়েছে তা হয় স্বয়ং তিনি নয়তো তাঁর কন্যা জীনৎ জমানী বেগম শুনিয়েছেন। জীনৎ জমানী বেগম এখনও জীবিত এবং পণ্ডিতের গলিতে থাকেন। ঘটনাগুলি এই ধরনের :

যে সময় আমার ঠাকুরদার বাদশাহী শেষ হল এবং সিংহাসন মুকুট লুণ্ঠিত হওয়ার সময় এগিয়ে এলো সে সময় দিল্লীর লাল কেল্লায় কান্নাকাটির ধুম পড়ে গেছে। চারিদিকে বিপন্ন আর্তি। শাদা ধবধবে শ্বেতপাথরের বাড়িগুলি দেখায় কালো-কালো। তিন বেলা কেউ কিছু খায়নি। জীনৎ আমার কোলে, দেড় বছরের শিশুকন্যা দুধের জন্য কাঁদছিল। ভাবনা চিন্তায় না আমার বুকে দুধ ছিল, না কোনো ধাইয়ের। আমরা সবাই যখন এমনি বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন বসেছিলাম, জিল্লে সুভানীর (মোগল যুগে রাজাকে এই উপাধিতেই সম্বোধন করা হ'ত) বিশেষ খোজা আমাদের ডাকতে এলো। মধ্যরাত্রি, নিস্তব্ধতার পরিবেশ, গোলাগুলির নির্ঘোষে বুক কেঁপে কেঁপে ওঠে কিন্তু রাজার হুকুম পাওয়ামাত্রই আমরা হাজিরী দিতে পৌছে গেলাম। হুজুর তখন মুসল্লার (নামাজ পড়ার মাদুর) উপর বসে। হাতে জপমালা। যখন আমি সামনে গিয়ে মাথা নত করে তিনবার বন্দেগী করলাম, হুজুর আমাকে বড় স্নেহে কাছে ডাকলেন ও বললেন, "কুলসুম, তোমাকে আমি খোদার হাতে সঁপে দিচ্ছি। ভাগ্যে থাকলে আবার দেখা হবে। তুমি তোমার স্বামীকে নিয়ে এখুনি কোথাও বেরিয়ে পড়। আমিও যাব। মন তো চায় না যে এই শেষ সময় তোমাদের চোখের আড়াল করি কিন্তু সঙ্গে রাখলে তোমার ক্ষতি হওয়ার ভয় রয়েছে। আলাদা থাকলে হয়তো খোদা তোমাদের কোনো ভালো ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।"

এই বলে হুজুর তাঁর করকমল যা কাঁপুনিরোগে কাঁপছিল উপরে ওঠান ও অনেকক্ষণ ধরে উঁচু গলায় আল্লার কাছে আরজু করতে থাকেন :

"খোদাবন্দ এই বেওয়ারিস বাচ্চাদের তোমার হাতে সঁপে দিচ্ছি। মহলে যারা বাস করত তারা আজ জনহীন জঙ্গলে যাচ্ছে। দুনিয়াতে এদের সাহায্য করার কেউ নেই। তৈমুরের নামের মর্যাদা রক্ষা কোরো এবং এই নিরাশ্রয় নারীদের ইজ্জৎ বাঁচিও। হে পরোয়ারদিগার (প্রতিপালক ঈশ্বর) শুধু এই নয়, বরঞ্চ সমস্ত হিন্দুস্থানের তাবৎ হিন্দু-মুসলমান আমার সন্তান এবং সবারই উপর আজ বিপদ সমাচ্ছন্ন। আমি অপয়া, আমার কর্মদোষে এদের মানহানি করো না এবং সবাইকে কষ্ট-হায়রানি থেকে মুক্তি দাও।"

তারপর তিনি আমার মাথায় হাত রাখলেন। জীনৎকে আদর করলেন ও আমার স্বামী মির্জা জিয়াউদ্দীনকে কিছু গয়না-গাঁটি দিয়ে নূর মহল সাহেবাকে আমাদের পথের সঙ্গিনী করে দিলেন। নূর মহল ছিলেন হুজুরের বেগম।

শেষরাতে কেল্লা থেকে বের হল আমাদের কাফেলা। দু জন পুরুষ ও তিন জন স্ত্রীলোক। পুরুষদের মধ্যে একজন আমার স্বামী মির্জা জিয়াউদ্দীন এবং অন্যজন মির্জা উমর সুলতান যিনি ছিলেন বাদশার ভগ্নীপতি। মেয়েদের মধ্যে এক আমি, দ্বিতীয় নবাব নূর মহল এবং তৃতীয় জন বাদশার রেখান হাফিজ সুলতান। যে সময় আমরা রথে বসি সেটা রাত্রির শেষ প্রহর। সমস্ত তারাই অদৃশ্য শুধু শুকতারা ঝিলমিল করছিল। আমরা যখন আমাদের সাজানো সংসার ও সুলতানী মহলের দিকে শেষবার তাকালাম বুক টনটনিয়ে উঠল আমাদের, চোখ ফেটে জল এলো। নবাব নূর মহলের চোখও জলে ভরা। শুকতারার ঝিলিক নূর মহলের চোখে ধরা দিয়েছে।

শেষ পর্যন্ত লাল কেল্লা থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে কোরালী গ্রামে পৌছোলাম এবং সেখানে আমাদের রথচালকের বাড়ীতে নামলাম। খেতে পেলাম বাজরার রুটি ও ঘোল। সে সময় খিদের চোটে তাও বিরিয়ানী পোলাওর চেয়ে বেশী স্বাদু লাগল। একদিন কেটে গেল শান্তিতে। কিন্তু পরের দিন জাট ও গুজররা জড়ো হয়ে কোরালী লুঠ করতে চড়াও হলো। তাদের সঙ্গে শত শত মেয়েলোকও ছিল, তারা ডাইনিদের মত আমাদের ছেঁকে ধরল। সমস্ত গয়নাগাঁটি ও কাপড়-চোপড় ওরা খুলে নিল। যে সময় এই দুর্গন্ধময় পচা মেয়েলোকগুলো তাদের নোংরা হাত দিয়ে আমাদের গলা খুবলে-খুবলে দিচ্ছিল তখন তাদের ঘাগরা থেকে এমন বিচ্ছিরি গন্ধ বেরুচ্ছিল যে আমাদের দম আটকে আটকে যাচ্ছিল।

এই লুঠের পরে আমাদের কাছে এতটুকুও কিছু অবশিষ্ট রইল না যাতে একবেলার খাবার জোটে। আমরা তখন বিহ্বল, না জানি এবার কি হয়। তেষ্টায় জীনৎ কাঁদছিল। সামনে দিয়ে একজন জমিদার (কৃষক) যাচ্ছিল। নিরুপায় হয়ে তাকে ডাক

দিলাম, "ভাই, এই বাচ্চাটাকে একটু জল এনে দাও।" জমিদার তক্ষুনি গিয়ে মাটির পাত্রে জল নিয়ে এল। বললে, "আজ থেকে তুই আমার বোন ও আমি তোর ভাই।" এই জমিদার কোরালী গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থ। তার নাম ছিল বস্তী। সে তার গরুর গাড়ি জুতে আমাদের সবাইকে বসিয়ে বলে "যেখানে বলবে সেখানে পৌঁছে দেব।" আমরা বলি, "মীরাট জেলায় অজারাতে মীর ফয়েজ আলী শাহী হাকিম থাকেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বেশ ভালো। সেখানে নিয়ে চল।" বস্তী আমাদের অজারাতে নিয়ে গেল। কিন্তু মীর ফয়েজ আলী চূড়ান্ত খারাপ ব্যবহার করলেন। সোজা কানের উপর হাত রেখে বললেন, তোমাদের এখানে থাকতে দিয়ে আমার ঘর গেরস্থালি নষ্ট হতে দিতে পারি না (মীর ফয়েজ আলীর ছেলে যখন এই বই পড়েন তখন বলেন যে বেগম সাহেবার বক্তব্য ঠিক নয়। মীর ফয়েজ আলী তাঁদের সবাইকে নিজের কাছে রেখেছিলেন এবং সাহায্য করেছিলেন।)

ঘন নিরাশায় ভরা সময় ছিল সেটা। একে তো ভয় পিছন থেকে ইংরেজ সৈন্য এলো বুঝি। তার উপর আমাদের অবস্থা এতই খারাপ যে সবাই বিরূপ। যারা আমাদের চোখের ইশারায় হাটতো-চলতো আর সবসময় চৌকস থাকত যে আমাদের হুকুম পাওয়ামাত্রই যেন তা তা মল হয়—তারাই আজ আমাদের মুখদর্শন করতে চায় না। জমিদার বস্তীকে বাহবা দি যে সে তার ধর্ম-বোনকে শেষ পর্যন্ত সঙ্গ দিয়েছে। নিরুপায় আমরা অজারা থেকে রওনা হলাম ও হায়দ্রাবাদের পথ ধরলাম। মেয়েরা বস্তীর গরুর গাড়িতে ও পুরুষরা পায়ে হেঁটে। তৃতীয় দিন পৌঁছোলাম এক নদীর তীরে যেখানে কোয়লের নবাবের বাহিনী শিবির গেড়ে অবস্থান করছিল। তারা যখন শুনল, আমরা শাহী খানদানের লোক তখন তারা খুব খাতির-খিদমৎ করল আর হাতিতে বসিয়ে নদী পার করে দিয়ে গেল। আমরা নদীর অন্য পারে নামামাত্র সামনে থেকে সৈন্য এসে পৌঁছল ও নবাবের সৈন্যের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ বেধে গেল।

আমার স্বামী ও মির্জা উমর সুলতান চাইছিলেন নবাবের সৈন্যে যোগদান করে যুদ্ধ করতে কিন্তু রিসালদার বলে পাঠালেন, আপনারা মেয়েদের নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে যান। আমরা যেমন করে হোক মোকাবিলা করবো। সামনে ছিল ক্ষেত আর তাতে পাকা ফসল। আমরা তার মধ্যে গিয়ে লুকিয়ে পড়লাম। জানি না সেই নিষ্ঠুররা দেখে ফেলেছিল কিনা - হয়তো বা হঠাৎই গুলি এসে লাগল। যাই হোক একটা গুলি ক্ষেতের মধ্যে এসে পড়ায় সমস্ত ক্ষেত দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকে। সেখান থেকে বেরিয়ে পালাই আমরা। কিন্তু হায়, কি বিপদ, আমরা পালাতেও জানি না। ঘাসে পা জড়িয়ে যাওয়ায় বারে-বারে আছাড় খেয়ে পড়ি। মাথা ঢাকবার ওড়না ওখানেই পড়ে রইল। অনাবৃত মাথায়, বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাওয়া অবস্থায় অনেক কষ্টে ক্ষেত থেকে বের হয়ে এলাম। আমার ও

নবাব মহলের পা রক্তাক্ত। তেষ্টায় মুখ থেকে জিভ বেরিয়ে আসছে। জীনৎ বারে বারে জ্ঞান হারিয়ে ফেলছে। পুরুষরা আমাদের সামলাচ্ছেন কিন্তু আমাদের সামলানো কি চাট্টিখানি কথা!

ক্ষেত থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে নবাব নূরমহল মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। জীনৎকে বুকের মধ্যে নিয়ে আমি আমার স্বামীর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম আর মনে মনে বলছিলাম, আল্লা, আমরা যাই কোথায়। কোনো ভরসাই কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ভাগ্য এমনই পালটালো যে শাহী থেকে ফকিরীতে নেমে এলাম। কিন্তু ফকিররা তো শান্তি ও স্বস্তিতে থাকে। আমাদের ভাগ্যে তাও নেই।

সৈন্যরা যুদ্ধ করতে করতে অনেক দূর চলে গিয়েছিল। বস্তী গিয়ে নদী থেকে জল আনে। আমরা জল খেলাম ও নবাব নূরমহলের মুখের উপর জলের ছিটে দেওয়া হল। নূরমহল কাঁদতে শুরু করেন, বলেন, এখুনি স্বপ্নে তোমার বাবা জিল্লে সুভানীকে দেখলুম। শিকলে বাঁধা দাঁড়িয়ে আছেন আর বলছেন :

"আজ আমাদের মত গরিবের জন্য কাঁটায় ভরা ধুলোর বিছানা মখমলের ফরাশ থেকে ঢের ভালো। নূর মহল, ব্যাকুল হয়ো না। সাহসে বুক বেঁধে কাজ কর। নসীবের লিখন, বার্ধক্যে এইসব কঠোরতা সহ্য কর। আমার কুলসুমকে একটু দেখিয়ে দাও। জেলখানায় যাওয়ার আগে তাকে একবার দেখতে চাই।"

বাদশার এই সব কথা শুনে আমার মুখ থেকে 'হায়' বেরিয়ে এল আর ঘুম ভেঙে গেল। কুলসুম, সত্যি সত্যি কি বাদশাকে শিকলে বেঁধেছে? সত্যিই কি ওরা তাঁকে কয়েদীদের মত জেলে পাঠিয়ে দিয়েছে? মির্জা উমর সুলতান জবাব দিলেন, এ তোমার নিছক খেয়াল। বাদশারা বাদশাদের সঙ্গে এরকম খারাপ ব্যবহার করে না। তুমি ভয় পেও না। তিনি বহাল তবিয়তেই আছেন। বাদশার বেয়ান হাফিজ সুলতান বললেন, এই মড়া ফিরিঙ্গিরা বাদশার মূল্য কি ছাই জানে? তারা নিজেরাই তাদের সুলতানের মাথা কেটে ষোল আনায় বিক্রী করে (রৌপ্যমুদ্রার প্রতি ইশারা যাতে রাজার মাথার ছাপ থাকে—হসন নিজামী)। নূর মহল পিসী, তুমি তো তাঁকে শিকল পরা অবস্থায় দেখেছ। আমি বলি, এই বেনে ফেরিআলারা এর চেয়েও বেশী খারাপ ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু আমার স্বামী মির্জা জিয়াউদ্দীন আশ্বাসের কথা বলে সবাইকে শান্ত করেন।

এরই মধ্যে বস্তী নৌকোর উপর গাড়ী চাপিয়ে এপারে নিয়ে আসে ও আমরা তাতে বসে রওনা হই। অনতিদূর গিয়েই সন্ধ্যে নেমে আসে এবং আমাদের গাড়ী এক গাঁয়ে গিয়ে থামে। সেই গ্রামে মুসলমান রাজপুতদের বসতি। গাঁয়ের মোড়ল আমাদের জন্য একটি কুঁড়েঘর খালি করিয়ে দেয়। তাতে শুকনো ঘাস ও খড়ের বিছানা পাতা। যাকে

ওরা পিয়াল বা পয়াল বলে সেই ঘাসের ওপরেই তারা ঘুমোয়। আমাদেরও বেশ খাতির ক'রে (যা তাদের হিসেবে বেশ উঁচুদরের খাতির) তারা এই নরম বিছানা দেয়।

আমার প্রাণ তো এই জঞ্জাল দেখে আইঢাই করতে থাকে। কিন্তু সে সময় করাই বা কী যায় অথবা কী-ই বা হতে পারত। বাধ্য হয়ে তার ওপরেই শুয়ে পড়ি। সারাদিনের ধকল ও ক্লান্তির পর নিরুদ্বেগ নিশ্চিন্ত হওয়ার দরুন ঘুম নেমে এল চোখে।

মাঝরাতে হঠাৎই সবার ঘুম ভেঙে গেল। ঘাসের শীষগুলো ছুঁচের মত বিঁধছিল গায়ে। আর যেখানে সেখানে ডাঁশের কামড়। সে সময় কি যে অস্বস্তি হচ্ছিল খোদাই জানেন। মখমলের বালিশ ও নরম তুলতুলে রেশমের বিছানার অভ্যেস আমাদের। তাই যা কিছু কষ্ট নইলে আমাদের মতই এ গ্রামে অন্য লোকেরা রয়েছে যারা এই ঘাসের ওপরেই গভীর ঘুমে অচেতন। অন্ধকার রাত্রি, চারিদিক থেকে শেয়াল ডাকে আর আমার বুক ভয়ে কাঁপে। ভাগ্য পালটাতে দেরী হয় না। কে ভাবতে পারত যে একদিন শাহন্‌শাহে হিন্দের (ভারত সম্রাট) ছেলেপিলেরা এইভাবে ধুলোর উপর আশ্রয় নেবে ও ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াবে। এইভাবে পদে পদে ভাগ্য বিড়ম্বনার তামাশা দেখতে দেখতে হায়দ্রাবাদ পৌঁছে গেলাম ও সীতারাম পেঠেতে একটি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হল। জব্বলপুরে আমার স্বামী একটি রত্নজড়িত আংটি বিক্রী করে দেন যেটি লুঠপাট থেকে বেঁচে গিয়েছিল। তাই দিয়ে পথের খরচ চলে আর এখানেও কিছুদিন থাকার ব্যবস্থা হয়। শেষ পর্যন্ত যা কিছু কাছে ছিল সবই শেষ হয়ে গেল। এবার ভাবনা পেট ভরাবার কি ব্যবস্থা করা যায়। আমার স্বামী বেশ উঁচু দরের খুশনবীশ (লিপিকার) ছিলেন। তিনি লতা-পাতা এঁকে সুন্দর লিখনে হজরৎ মোহম্মদ ও তাঁর পরিবারের গুণগান (দরুদ শরীফ) লিখলেন এবং চারমিনারে সেটি বিক্রী করতে গেলেন। লোকেরা সেটা দেখে আশ্চর্যে হাঁ হয়ে গেল। প্রথম দিন দরুদ শরীফের দাম উঠল পাঁচ টাকা। তারপরে এমন হল যে যখনই তিনি কিছু লিখতেন তক্ষু'ন তা বিক্রী হয়ে যেত। এই করে আমাদের দিন ভালভাবেই কাটছিল। কিন্তু মুসা নদীর বন্যার ভয়ে আমরা দারোগা আহমদের বাড়িতে চলে এলাম। এই লোকটি ছিল হুজুর নিজামের বিশেষ কর্মচারী।

কিছুদিন পরে গুজব রটলো যে নবাব লশ্‌কর জঙ্গ যিনি শাহজাদাকে নিজের কাছে আশ্রয় দিয়েছিলেন ইংরেজদের কোপভাজন হয়েছেন এবং এখন কোনো লোকই দিল্লীর শাহজাদাদের আশ্রয় দেবে না। বরঞ্চ যদি কোনো শাহজাদার খবর পাওয়া যায় তাহলে তাকে ধরার চেষ্টা করা হবে। আমরা সবাই এই খবরে ভয় পেয়ে গেলাম, আমি আমার স্বামীকে বাইরে বেরুতে বাধা দিলাম, যদি কোনো শত্রু ওঁকে ধরিয়ে দেয়। বাড়িতে বসে বসে যখন অনাহারের পালা এসে পড়ে তখন নিরুপায় হয়ে একজন নবাবের ছেলেকে কোরাণ শরীফ পড়াবার চাকরি আমার স্বামী মাসিক বারো টাকা মাইনেতে নিলেন।

তিনি চুপিচুপি তার বাড়ি গিয়ে পড়িয়ে ফিরে আসতেন কিন্তু সেই নবাব এমন বদ-মেজাজী ও খারাপ লোক ছিলেন যে আমার স্বামীর সঙ্গে সর্বদা সাধারণ চাকরের মত ব্যবহার করতেন যা তাঁর পক্ষে বরদাস্ত করা খুবই শক্ত ছিল। তিনি বাড়ি ফিরে কেঁদে কেঁদে দোয়া চাইতেন, হে আল্লা, এই অপমানের চাকরি থেকে তো মৃত্যু লক্ষগুণ ভালো। তুই আমাকে এমনই ভিখিরি করে দিলি? কাল পর্যন্ত ঐ নবাবের মত লোক আমাদের গোলাম ছিল আর আজ আমিই তার গোলাম। এরই মধ্যে কেউ গিয়ে মিঁয়া নাজিমুদ্দীন সাহেবকে আমাদের কথা বলে। হায়দ্রাবাদে মিয়াঁর খুব সম্মান ছিল কেননা মিয়াঁ হজরৎ কালে মিয়াঁ সাহেব চিস্তি নিজামী ফখরীর ছেলে যাঁকে দিল্লীর বাদশা ও নিজাম নিজেদের পীর বলে মানতেন। মিয়াঁ রাত্রে আমাদের কাছে এলেন এবং আমাদের দেখে খুব কাঁদলেন। এক সময় ছিল যখন তিনি কেল্লায় আসতেন তখন তাঁকে সোনার জরীর কাজ করা মসনদে বসানো হত। বাদশা-বেগম নিজের হাতে বান্দা-বাঁদীর মত সেবা করতেন। আজ যখন তিনি আমাদের বাড়িতে এলেন ছেঁড়া চটও ছিল না যে তাঁকে আরামে বসতে দি। বিগত দিনগুলি চোখের সামনে ভাসতে থাকে। খোদার দেওয়া জাঁকজমক কি ছিল আর কি হয়ে গেল। মিয়াঁ অনেকক্ষণ ধরে হালচাল জিজ্ঞেস করতে থাকেন। তারপর বিদায় নিলেন। সকাল বেলা তাঁর বার্তা পেলাম—আমি খরচ-পত্রের বন্দোবস্ত করে দিয়েছি এবার তুমি হজ করার সংকল্প নাও। তাই শুনে মন খুশীতে ভরে ওঠে ও পুণ্যতীর্থ মক্কার জন্য প্রস্তুতি চলতে থাকে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে. হায়দ্রাবাদ থেকে রওনা হয়ে বোম্বাই এলাম এবং এখান থেকে আমাদের প্রকৃত দরদী ও সঙ্গী বস্তীকে খরচখরচা দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিলাম। জাহাজে তো বসলাম কিন্তু যে যাত্রীই শোনে যে আমরা হিন্দুস্থানের বাদশা-বংশের সে-ই আমাদের দেখার জন্য উতলা হয়ে ওঠে। সে সময় আমরা সবাই দরবেশের মতো রঙের পোশাকে। একজন হিন্দু যার বোধ হয় এডেনে দোকান ছিল এবং আমাদের বিষয়ে কিছু জানত না, জিজ্ঞাসা করে "তোমরা কোন পন্থের ফকির।" তার প্রশ্ন আমাদের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে নুনের ছিটের মত এসে লাগে। আমি বলি, "আমরা মজলুম (উৎপীড়িত) শাহ গুরুর চেলা। তিনিই আমাদের বাপ, তিনিই আমাদের গুরু। পাপীরা তাঁর ঘরদোর কেড়ে তাঁর কাছ থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে জঙ্গলে তাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি আমাদের মুখ দেখার জন্য লালায়িত আর তাঁর দর্শনের জন্য আমরা আকুলি-বিকুলি করছি।"

নিজেদের ফকিরী দশার বিষয়ে এর চেয়ে বেশী আর কি বলা যায় যখন সে আমাদের আসল পরিচয় পেল এসে বলে, বাহাদুরশা আমাদের সকলেরই গুরু এবং বাপ। কিন্তু কি করা যায় যখন রামচন্দ্রজীর মর্জি নিষ্পাপ ব্যক্তির উচ্ছেদ হোক।

মক্কায় পৌঁছোলাম তো আল্লামিয়াঁ আমাদের থাকার এক অদ্ভুত ব্যবস্থা করে

দিলেন। আব্দুল কাদের নামে আমার এক গোলাম ছিল যাকে মুক্ত করে আমি মক্কা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এখানে এসে সে অনেক ধনসম্পত্তি উপার্জন করে এবং জমজমের (মক্কার একটি জলস্রোতের নাম, যার জল অতি পবিত্র মনে করা হয়) দারোগা হয়ে যায়। আমাদের আসার খবর পেয়ে সে ছুটে আসে আর পায়ের উপর আছড়ে পড়ে অঝোরে কাঁদতে থাকে। তার বাড়ি ছিল খুবই ভাল ও আরামদায়ক। আমরা সবাই সেখানেই ডেরা পাতি। কিছুদিন পরে রুমী সুলতানের নায়েব, যে মক্কায় বাস করত, খবর পেয়ে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল। কেউ তাকে বলেছিল যে দিল্লীর বাদশার মেয়ে এসেছে। পরদা না করেই কথা বলে। নায়েব সুলতান আব্দুল কাদিরের মারফত দেখা করার জন্য খবর পাঠাল, আমি তার আবেদন মঞ্জুর করলাম।

পরদিন সে আমার বাড়ি এল এবং আদবকায়দা মাফিক ও বিনয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বললো। শেষে সে তার ইচ্ছা জানাল যে সে আমাদের আসার খবর হুজুর সুলতানকে দিতে চায়। ওঁকে উত্তর আমি খুবই অবহেলায় দিলাম—আমরা সবাই এখন অনেক বড় সুলতানের দরবারে এসেছি। আর আমাদের অন্য কোনো সুলতানের পরোয়া নেই। নায়েব আমাদের খরচের জন্য বেশ ভালো অংকের টাকা মঞ্জুর করে এবং আমরা নয় বছর সেখানেই থেকে যাই। তারপর এক বছর বোগদাদ শরীফে, এক এক বছর নজফ অশরফে ও কারবালায় কাটাই। এতদিন কেটে যাওয়ার পর শেষকালে দিল্লীর স্মৃতি বড়ই ব্যাকুল করে তোলে। তখন দিল্লী ফিরে আসি। এখানে ইংরেজ সরকার ভীষণ দয়ার্দ্র হয়ে মাসিক দশ টাকা পেনশন মঞ্জুর করে। পেনশনের টাকার পরিমাণ শুনে গোড়ায় হাসি পেল। আমার বাবার এত বড় দেশ কেড়ে নিয়ে দশ টাকা ক্ষতিপূরণ। তারপর খেয়াল হল. দেশ তো খোদার, কারুর বাপের নয়, সে যাকে চায় তাকে দেয়। যার কাছ থেকে ইচ্ছে কেড়ে নেয়। মানুষের তো তাতে কিছুই করার নেই।

2. গুলবানো

খোদার আশীর্বাদে গুলবানো পনেরো বছরের হল। যৌবনের রাতগুলো তাকে কোলে নিয়ে দোলা দেয়, মনোরথ পূর্ণ হওয়ার দিনগুলি শরীরে সুড়সুড়ি জাগায়। মির্জা দারাবখ্‌ৎ বাহাদুর সাবিক ওয়ালী অহদ (ভূতপূর্ব যুবরাজ) বাহাদুর শা'র ছেলে। বাবা তাকে বড়ই আদরে সোহাগে প্রতিপালন করেছিলেন আর তিনি যখন দুনিয়া ছেড়ে কবরে গেলেন গুলবানোর সেবাযত্ন আগের চেয়ে বেড়ে গেল। মা বলেন, ক্ষুদে অভাগীটা বুকে বড় ব্যথা পেয়েছে। বাপের জন্য হেদিয়ে না পড়ে। এমনভাবে একে ভুলিয়ে রাখ যে তাঁর ভালবাসার কথা যেন ভুলে যায়।

এদিকে ঠাকুরদা অর্থাৎ বাদশা বাহাদুরশার অবস্থা এই যে পৌত্রীর আদর-সোহাগের ব্যাপারে কিছুতেই পিছপা নন। নবাব জীনৎ মহল তাঁর অতি প্রিয়পাত্রী ও চোখ-কাড়া স্ত্রী। জওয়ান বখ্‌ৎ তাঁরই পেটের শাহজাদা। যদিও মির্জা দারা বখ্‌তের অসময়ে মারা যাওয়ার দরুন ওয়ালী অহদের মনসব বা পদটা মির্জা ফকরু পেয়েছে কিন্তু জওয়ান বখ্‌তের প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে ওয়ালী অহদের কোনো তুলনাই হয় না। আর জীনৎ মহল তলায় তলায় ইংরেজদের সঙ্গে জওয়ান বখ্‌ৎকে সিংহাসনে বসাবার চক্রান্ত চালাচ্ছে। জওয়ান বখ্‌তের এমন ধুমধাড়াক্কার বিয়ে হল যে, মোগল ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে এরকম জাঁকজমকের জুড়ি মেলা ভার। গালিব ও জওক রচনা করেন সেহরা (বিবাহের মাঙ্গলিক গীত) এবং তাতে তাঁদের মধ্যে কবিয়ালীর সেই প্রসিদ্ধ রেষারেষির সংকেত থাকে যার উল্লেখ শামসুল উলেমা আজাদ দেহলবী তাঁর বই 'আবে হয়াৎ' এ করেছেন। গালিবকে তাই বাধ্য হয়ে লিখতে হয় যে 'কবিতার প্রথম পংক্তিতে কিছু অপমানজনক কথা যদিও বলা হয়েছে, এমনিতে ওস্তাদ জওকের সঙ্গে তাঁর কোনো শত্রুতা নেই।

এসব তো ছিলই তাছাড়া জওয়ান বখ্‌ৎ ও জীনৎ মহলের সামনে সবাই ছিল নিষ্প্রভ। কিন্তু গুলবানোর ব্যাপার ছিল সবচেয়ে বিচিত্র। এই অনাথ মেয়েটির প্রতি বাহাদুরশার যে ভালোবাসা ও প্রকৃত অনুরাগ ছিল তাঁর সেরকম স্নেহ ও প্রীতি জীনৎ মহল ও জওয়ান বখ্‌ৎও পায়নি। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে গুলবানো কি স্তরের জাঁকজমকে জীবনযাপন করত। মির্জা দারা বখ্‌তের আরো ছেলেমেয়ে ছিল কিন্তু গুলবানো ও তার মার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল সবচেয়ে বেশী।

গুলবানোর মা ছিল ডোমনী এবং মির্জা তাকে অন্য বেগমদের চেয়ে বেশী ভালবাসতেন। যখন তিনি মারা যান তখন গুলবানো ছিল বারো বছরের। দিল্লীর হজরৎ

মখদুম নসীরুদ্দীন চিরাগের দরগাতে তাঁকে কবর দেওয়া হয় যা দিল্লী থেকে ছয় মাইল দূরে পুরোনো দিল্লীর ভগ্নাবশেষে স্থিত। গুলবানো প্রতি মাসে মাকে নিয়ে বাবার কবর দেখতে যেত। গেলেই কবর জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলত, "আব্বা, আমাকেও পাশে শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও। তুমি না থাকায় আমার মন কেমন করে।"

গুলবানো যখন পনেরোয় পা রাখে তখন যৌবন ছোটবেলার আব্দার ও দুষ্টুমি ভুলিয়ে দিলেও চঞ্চলতা এত বাড়িয়ে দেয় যে রাজপ্রাসাদের প্রতিটি মানুষ ত্রাহি ত্রাহি করতে শুরু করে। সোনার পালঙে দোশালা মুড়ি দিয়ে ঘুমায়। সন্ধ্যে হল বাতি জ্বলল আর বানো গিয়ে পালঙে শুয়ে পড়ল। মা বলে, "চেরাগেতে পড়ল বাতি, আদুরীর আধেক রাতি।" শুনে একটু হেসে হাই তুলে আর আড়ামোড়া ভেঙে মাথার ছড়িয়ে পড়া চুল গুটিয়ে নিয়ে বলে, "আচ্ছা মা, তোমার কি? ঘুমোই—সময় নষ্ট করি—তোমার কী নিয়ে নি? মিছেই তুমি জ্বলে পুড়ে মর।" মা বলে, "বানো, আমি জ্বলবো কেন? মনের সুখে বিশ্রাম কর তুমি। খোদা যেন সর্বদা তোমাকে সুখের ঘুম ঘুমোতে দেন। আমি বলতে চাই যে বেশী ঘুম মানুষকে অসুস্থ করে তোলে। সন্ধ্যেবেলা তুমি ঘুমিয়ে পড় তাই সকালে তাড়াতাড়ি ওঠা উচিত। কিন্তু তোমার অবস্থা ভাবো, দশটা বেজে যায় বাড়ির চারিদিকে রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়ে তবু বাঁদীরা টুঁ শব্দটি করতে পারে না এই ভয়ে যে বানোর ঘুম না ভেঙে যায়। এমন ঘুমই বা কি? বাড়ির কাজকর্মও তো দেখা উচিত একটু। এখন আল্লার দয়ায় তুমি কচি খুকিটি নও। পরের বাড়ি যেতে হবে। যদি এই অভ্যেসই থেকে যায় তাহলে কেমন করে পোয়াবে"

মা'র এই ধরনের বক্তৃতা শুনে গুলবানো চটে উঠত, বলত, "তুমি এ ছাড়া অন্য কথা জানো না বুঝি? বলো না আমার সঙ্গে কথা। যদি চোখের বালি হয়ে গিয়ে থাকি তোমার স্পষ্ট বলো, আমি দাদা হজরৎ এর (বাহাদুরশা) কাছে গিয়ে থাকি।

সেই সময়েরই কথা—শাহজাদা খিজর সুলতানের ছেলে মির্জা দাবর শিকোহ গুলবানোর কাছে আসা-যাওয়া আরম্ভ করে। কেল্লাতে পরস্পরের মধ্যে পরদা করার প্রথা ছিল না। শাহী খানদানের লোকেরা নিজেদের মধ্যে পরদা করত না। এই কারণে মির্জা দাবরের আসা-যাওয়া ছিল অব্যাহত।

গোড়ায় গুলবানো ছিল তার বোন ও সে ছিল তার ভাই। খুড়ী-জেঠীর দুটি সন্তান বলেই তাদের লোকে ভাবত। কিন্তু ভালোবাসা অন্য এক সম্বন্ধ গড়ে তুলল। মির্জা গুলবানোকে অন্য কোনো ভাবে নেয় আর গুলবানোও বাহ্য সম্পর্ক ছাড়াও অন্য এক চোখে দেখতে শুরু করে।

একদিন সকালবেলা মির্জা গুলবানোর কাছে এসে দেখে, বানো কালো রঙের দোশালা মুড়ি দিয়ে সোনালী পালঙে ফুলের বিছানায় পা ছড়িয়ে ঘুমে অচেতন। মুখ

হাঁ করা। নিজেরই হাতের উপর মাথা। বালিশ আলাদা পড়ে। দুটো বাঁদী মাছি তাড়াচ্ছে।

দাবর শিকোহ্ কাকিমার কাছে বসে গল্প করে ও আড় চোখে গুলবানোর অচৈতন্য অবস্থা দেখে। শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে বলে ওঠে, "হ্যাঁ কাকিমা, হজরৎ বানো কী এত বেলা অব্দি ঘুমোয়? রোদ্দুর মাথার উপর এসে গেছে। এবার ওকে জাগিয়ে দেওয়া উচিত।"

কাকিমা বলেন, "বাবা, বানোর মেজাজ তো জানোই! ওকে জাগিয়ে কে নিজের বিপদ ডেকে আনবে? ঝড় বইয়ে দেবে না?" দাবর বলে; "দেখুন, আমিই জাগাচ্ছি। দেখি কি ক'রে?" কাকিমা হেসে বলেন, "জাগিয়ে দাও। তোমাকে আর কি বলবে। তোমাকে ও বেশ মানে।" দাবর গিয়ে তার পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দেয়। বানো আড়ামোড়া ভেঙে পা গুটিয়ে নেয় এবং হঠাৎ চোখ তুলে খুব রাগী চোখে পায়ের দিকে তাকায়। মনে করেছিল কোনো বাঁদীর বাঁদরামি। তার ধৃষ্টতার সাজা দিতে হবে। কিন্তু যখন সে এমন লোককে সামনে দেখতে পায় যার ভালোবাসায় তার বুক কানায় কানায় ভরে উঠেছে, তখন সে লজ্জায় দোশালার আঁচল মুখের উপর টেনে নেয় ও হড়-বড়িয়ে উঠে বসে। মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া এই দৃশ্য দাবর থরোথরো বুকে দেখে ও চেঁচিয়ে ওঠে, "এই নাও কাকিমা, আমি বানোকে জাগিয়ে দিয়েছি।"

ভালোবাসা অনেক এগিয়ে গেল। যখন প্রেমের দোলনায় দুলুনির গতি বাড়তে থাকে ও বিরহে চোখ থেকে ঘুম উধাও হয় গুলবানোর মার সন্দেহ হয় ও তিনি দাবর শিকোহকে বাড়িতে আসতে বারণ করে দেন।

* * *

দিল্লীর দরগা হজরৎ চিরাগের এক কোণায় বেশ সুন্দর দেখতে একটি স্ত্রীলোক ছেঁড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে রাত্রিবেলা হায় হায় করছিল। শীতকালের বৃষ্টি মুষলধারে পড়ছে। তীব্র হাওয়ার ঝাপটায় বৃষ্টির ছাট সেই জায়গাটা ভিজিয়ে দিচ্ছিল যেখানে স্ত্রীলোকটির বিছানা।

স্ত্রীলোকটি খুবই অসুস্থ। পাঁজরায় ব্যথা, জ্বর এবং অসহায় অবস্থায় একা পড়ে কাৎরাচ্ছে। জ্বরে বেহুঁশ অবস্থায় সে হাঁক লাগায়, "গুলবদন, এই গুলবদন, মড়ি, কোথায় মরে আছিস। শীগ্‌গির আয়, আমাকে শাল মুড়ি দিয়ে দে। দেখ না ছাট আসছে ভেতরে। পর্দা ফেলে দে। রোশনক তুই-ই আয় না। গুলবদন তো কোথায় পালিয়েছে, তার পাত্তা নেই। আমার কাছে নিয়ে আয় তো উনুনটা আর পাঁজরায় তেল মালিশ কর। ওরে, ব্যথায় যে আমার নিঃশ্বাস আটকে আসছে।"

যখন এই হাঁক লাগাবার পর কেউই এল না তখন সে মুখের উপর থেকে কম্বল সরিয়ে

চারিদিকে তাকায়। অন্ধকার দালানে ধূলিশয্যায় সে একা শুয়ে আছে। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বৃষ্টি বেশ জোরে পড়ছে। বিদ্যুৎ চমকালে একটি শাদা কবরের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। সেটি তার বাবার কবর।

এই দেখে সেই স্ত্রীলোকটি চেঁচিয়ে ডাকে, "বাবা, আমি তোমার গুলবানো। দ্যাখো, আমি একেবারে একা। ওঠো, আমার জ্বর বাড়ছে। উঃ, আমার পাঁজরায় বড় ব্যথা। ঠাণ্ডা লাগছে। আমার কাছে এই ছেঁড়া কম্বল ছাড়া মুড়ি দেবার আর কিছুই নেই। মা আমায় ছেড়ে গেছে। মহল থেকে আমাকে বের করে দিয়েছে। বাবা, আমাকে তোমার কবরে ডেকে নাও। ভয় করছে আমার কফিন থেকে মুখ বের করে আমাকে দেখ। পরশু থেকে কিচ্ছু খাইনি আমি। আমার গায়ে বিঁধছে ভিজে মাটি ও কাঁকর। ইঁটের উপর মাথা রেখে শুয়ে আছি আমি।

"কোথায় গেল আমার পালঙ? কোথায় গেল আমার দোশালা? বিছানা কোথায় আমার? বাবা বাবা, ওঠো, কতক্ষণ আর ঘুমোবে তুমি? উঃ কি ব্যথা, নিঃশ্বাস কেমন করে নি?"

এই বলতে বলতে সে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যায়। দেখে সে মরে গেছে ও তার বাবা মির্জা দারা বখ্‌ৎ তাকে কবরে নামাচ্ছেন এবং কেঁদে কেঁদে বলছেন, "এ হল বেচারীর মাটির পালঙ।"

হুঁশ ফেরে। বেচারী বানো গোড়ালি ঘষতে শুরু করে। মৃত্যু শিয়রে দাঁড়িয়ে, সে বলছে "নাও সাহেব, এবার আমি মরছি। কে আমার মুখে ফোঁটা ফোঁটা শরবৎ গড়িয়ে দেবে? কে আমাকে আমার শেষ সময়ে ইয়াসিন (কোরাণ শরীফের একটি অংশ) পড়ে শোনাবে? কে নিজের কোলে আমার মাথা টেনে নেবে? আল্লা, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই। তুমি একক। তোমার হবীব (হজরৎ মুহম্মদ সাহেব) আমার সাথী ও দেখাশোনা করার লোক আর এই চিরাগে আউলিয়া আমার প্রতিবেশী।

শাহজাদী মারা গেল এবং পরের দিন গরীবদের কবরখানায় তাকে সমাধিস্থ করা হল এবং সেটাই তার অনন্তকালের পালঙ যার উপর কেয়ামতের (মহাপ্রলয়) দিন পর্যন্ত সে ঘুমোবে।

3. শাহজাদী

বাড়িটার দেওয়ালগুলো ছিল কাঁচা যার একটা অংশ এই বর্ষাকালে পড়ে গিয়ে খারাপ হয়ে গেছে। দরজার উপর চটের পরদা ঝুলছে। আমি ডাক দিতে একটি বুড়ি দাসী বাইরে আসে আর শাহজাদী সাহেবা আমাকে ভেতরে ডেকে নেন।

বাড়িটার আঙিনা বড় ছোট। অতি কষ্টে হয়তো দুটো চারপাইয়ের সংকুলান হয়। দালান তো এত ছোট যে দুটো চারপাই তাতে আঁটবে না। দালানের উত্তর দিকে একটি ছোট্ট কুঠরিও আছে।

আমি যখন ভিতরে ঢুকলাম শাহজাদী সাহেবা চটের উপর বসেছিলেন। তারই উপর বসে শাহজাদী সাহেবা পানকুট্টিতে তাঁর পান ছেঁচছিলেন। চটটা বড় পুরোনো ও জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। তালিমারা একখানা শাদা চাদরও পাতা ছিল। ছোট্ট বালিশ, একটু ময়লাও হয়েছে। শাহজাদীর সামনে মাটির একটা বদনা যাতে ছাই ভরা। শাহজাদী সেটাকে পিকদান হিসেবে ব্যবহার করেন। ডানদিকে পানের ডাবর রাখা। ডাবরের কলাই নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু তার উপর পানের ছোপ নেই। দালানের কড়িকাঠ অনেক পুরোনো। কাঠবেড়ালি ও ইঁদুররা ঝরঝরে করে ফেলেছে তক্তাগুলো।

শাহজাদী সাহেবার মাথার চুল ধবধবে শাদা। চোখের পলক ও ভুরুও শাদা হয়ে গেছে। যৌবনে নিশ্চয়ই তাঁর লম্বা গড়ন ছিল তাই এখন বেশ বেঁকে গিয়েছেন। তাঁর কাপড়-চোপড় বেশ সাফ-সুতরো কিন্তু প্রত্যেক কাপড়ে জায়গায় জায়গায় তালি দেওয়া। তাঁর কণ্ঠস্বর বেশ পরিষ্কার এবং কথাবার্তা খাটি উর্দু ভাষায়—বেশ মিষ্টি ও লোককে প্রভাবিত করে। খুবই গম্ভীরভাবে ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। মুখের উপর অগুন্তি বলিরেখা। এবং শরীরও বেশ কাহিল।

তাঁর সামনে গিয়ে আমি অভিবাদন করলে তিনি বলেন, "বেঁচে-বর্তে থাক। বুঝলে মিয়াঁ, যবে থেকে চোখ খারাপ হয়েছে দরগা-শরীফে হাজির হতে পারিনি। তোমাকে কখনও দেখিনি কিন্তু অনেকদিন থেকে নাম শুনেছি। যখন বুড়ি ঠাকরুণ নাম নিয়ে বল্লে যে খোয়াজা সাহেব এসেছেন, দেখা করতে চান, বড় খুশী হলাম যে যাঁর নাম শুনতাম তিনি নিজেই আমার বাড়ি এসেছেন। তাঁর প্রতি আমার গুরুজনদের খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল আর আমি সর্বদা সতেরোর উর্সে (মুসলমান পীরের তিরোধান উৎসব) যেতাম। এখন চোখ নেই, হাত-পাও চলে না··· বলুন, কি মনে করে এলেন?"

আমি বলি, "আসার কারণ এখুনি বলছি। কিন্তু প্রথমে বলুন, এ বাড়িতে আপনার

কোনো কষ্ট হয় না তো ? এটা তো বড়ই ছোট বাড়ি এবং ছাদও জায়গায় জায়গায় ভাঙাচোরা। নিশ্চয়ই ঝুরঝুর করে মাটি ঝরে।" তিনি বলেন, "আরে মিয়া ! তুমি এ বিষয়ে অন্তত ভাবলে তো। যখন ভাগ্যই কেড়ে নিল কেল্লা ও রাজমহল তখন যা পাওয়া গেছে তাই ভাল। মাসে দেড় টাকা ভাড়ায় এর চেয়ে ভাল বাড়ি আর কোথায় পাবো? ছাদ থেকে মাটি তো ঝরেই আর একটি রাতও এমন যায় না যাতে অন্তত দু-চার বার পালঙের চাদর পরিষ্কার না করতে হয়। এক সময় ছিল যখন লালকেল্লার ভিতর নিজের মহলে ঘুমোতাম। ছাদে পাখি বাসা বেঁধেছিল। তার কিছু খড়-কুটো বিছানায় এসে পড়ায় রাত্তির ভোর ঘুমই এল না। আর এও এক সময়—রাতভোর মাটি ঝরে এবং এ কষ্ট সহ্য করতে হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করি, "সরকার থেকে কিছু পেনশন পান ?" জবাবে বলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, মাসে দশ টাকা অনেক দিন থেকে পাচ্ছি।" আমি বলি, "আর কোনো আয় আছে ?" তিনি বলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা বাড়ি আছে যার ভাড়া পাই সাত টাকা। গোড়ায় আমি ঐ বাড়িতেই থাকতাম। কিন্তু যখন থেকে চোখ হারালাম তখন থেকে মাসে দশ টাকায় কুলোয় না। তাই সে বাড়িটা ভাড়ায় দিয়েছি এবং নিজে কম ভাড়ার বাড়িতে চলে এসেছি। এক আছেন ঐ বুড়ি ঠাকরুণ আর আমি। বাড়ি ভাড়া ও আমাদের খাওয়া-পরার খরচ ছাড়া আবার পান সুপুরী ও লোক লৌকিকতাও ঐ সতেরো টাকায় চালাতে হয়।" আমি বলি, 'আমার ইচ্ছে, আপনি আপনার অবস্থা আমাকে জানান। আমি আমার বইতে তা লিখি কেননা আপনার বংশের অনেক পুরুষ ও নারীর অবস্থার বিষয়ে আমি লিখেছি।"

এ কথা শোনামাত্র শাহজাদী সাহেবা পান ছেঁচা বন্ধ করে আমার দিকে তাকালেন, বললেন, "না মিয়া, এ আমি চাই না যে আমার নাম বাড়িতে বাড়িতে গলিতে গলিতে ঘুরুক।" আমি বলি, "আপনার নাম লিখব না। শুধু হালচালের বিষয়ে লিখব।" তিনি জবাব দিলেন, "কীই বা হালচাল ?—শুধু দু'টো কথা—বাদশা ছিলাম, ফকির হয়েছি। এর চেয়ে বেশী যদি শুধাও তাহলে বলব—এরপরে আমরা মরেও যাব।"

আমি বলি, "আপনি আপনার হালচাল বলুন। আমি নাম-ঠিকানা লিখব না।" শাহজাদী সাহেবা এত রেগে গিয়েছিলেন যে অনেকক্ষণ থ মেরে বসে রইলেন, তারপর পানের ডাবর নিজের কাছে টেনে আমার জন্য একটা পানের খিলি সাজলেন এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "মিয়া, সেপাই বিদ্রোহের সময় আমার বয়স ছিল দশ এগারো বছর। আমরা কেল্লার ভিতর থাকতাম। বাদশা সলামৎ আমাদের খানদানের উপর একটু বিরস ছিলেন। কিন্তু আমাদের বেতন প্রতিমাসে আমরা পেতাম। তিন ভাই ছিল আমার, বোনের মধ্যে আমি। বাবা শেষ বয়সে আর একটা বিয়ে করেছিলেন।

যদিও আমার মা তখনও বেঁচে। বুড়ো বয়সে এই বিয়ের জন্য মা ও তাঁর সতীনের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটি লেগেই থাকত এবং আমরাও ভাই-বোন মিলে সৎমার সঙ্গে ঝগড়া করতাম। কিন্তু সৎমা আমাকে খুব ভালবাসতেন আর আমাকে মা ও সৎমা দু'জনেরই আদুরী মেয়ে বলা হত। খিদমৎ করার জন্য আমাদের বাড়িতে কয়েকজন পুরুষ ও মেয়ে চাকর ছিল। সেপাই বিদ্রোহের ছ মাস আগে সৎমার ওলাওঠা হল। তিনি মারা গেলেন। আমার দুই ভাইও সেই সময়ে ওলাওঠায় মারা যায়। আর সেপাই বিদ্রোহের সময় শুধু দুই ভাই-বোন বাবা ও মা ছিলাম আমরা।

বাদশা সলামৎ কেল্লা থেকে বেরিয়ে হুমায়ুনের মকবরায় চলে গেলেন। আরো কত কেল্লাবাসীই কেল্লা ছেড়ে বাইরে চলে গেলেন। কেল্লা হয়ে গেল খালি। কিন্তু আমাদের বাড়ি কেল্লা থেকে একটু আলাদা ছিল আর খুব মজবুত। এইজন্য বাবামশায় যেতে রাজি হলেন না, বললেন – বাইরে গেলেও মারা পড়ব আর বাইরে মরা হবে আরো খারাপ। সুতরাং এখানে বাড়িতেই থাকো। খোদার যা মর্জি এই বাড়িতেই হবে'খন।

বাদশা সলামতের যাওয়ার পর দুদিন পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে কেউ এল না। বার-বাড়ির কাজের চাকর ও বাড়ির বাঁদীরা সবাই পালিয়েছে। আমরা বাড়ির দরজা বন্ধ করে দিয়েছি। দেউড়িতে তিন চারটে দরজা ছিল। খুব ভারী-ভারী পাল্লা ও খুব মোটা মোটা আংটা ও শিকল লাগানো ছিল তাতে। তিন দিনের দিন বাড়ির বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ ও অনেক লোকজনের কথাবার্তার আওয়াজ শোনা গেল আর কারা যেন দরজা ভাঙতে শুরু করলে। আমার দাদার বয়স ছিল ষোল। বাবামশায় ও মা তখুনি উজু (নামাজ পড়ার পূর্বে শুচিতার জন্য হাত-পা ধোয়া) করলেন। আর দাদাকে বললেন, "মিয়াঁ ওঠো, তুমিও উজু কর। মরার সময় এসে গেছে।" একথা শুনে আমার বুক কেঁপে উঠল আর আমি গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলাম। তিনি কাঁদতে লাগলেন, আমাকে আদর করলেন। বললেন, ভয় পেও না। আল্লা সবাইকে মদৎ করেন। হয়তো তিনি বাঁচবার কোনো উপায় বের করে দেবেন। এর পর সবাই মিলে উজু করে, মুসল্লা পেতে সিজদায় মাথা নুইয়ে আল্লাতালার কাছে আশীর্বাদ চাইতে থাকি। দরজা ভাঙার আওয়াজ ক্রমাগত কানে আসছিল। আমরা সবাই প্রণত অবস্থাতেই ছিলাম যখন দশ-বারো জন গোরা ও দশ-বারো জন শিখ সঙ্গীন চড়ানো বন্দুক নিয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল। বাবা ও দাদা তখুনি প্রণত অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। বাবামশায় আমাকে কোলে নিয়ে চাদরে মুখ ঢেকে দিলেন। একজন শিখ বাবামশায়কে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কে এবং এখানে কেন বসে রয়েছ ? বাবামশায় জবাব দিলেন—এ আমার বাড়ি, আমি এখানে থাকি। শাহ আলম বাদশার সন্তান আমি। সেই শিখটি ইংরেজ অফিসারকে এই কথা বোঝাল। ইংরেজ

অফিসার ভাঙাচোরা উর্দুতে কিছু বলে যা আমি বুঝতে পারি না। তারপর শিখটি বাবাকে বললে, সাহেব বলছেন যে বাদশা পালিয়ে গেছেন। অন্য সবাই পালিয়েছে। তুমি কেন পালাওনি? বাবামশায় বললেন, বাদশা আমার উপর একটু অসন্তুষ্ট ছিলেন। সেইজন্য তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাননি আর আমিও তাঁর সঙ্গে যাইনি। তাছাড়া আমরা সেপাইদের লড়াই-দাঙ্গাতে শরিক হইনি। এও আমাদের পুরোপুরি বিশ্বাস যে ইংরেজ সরকার নির্দোষদের কষ্ট দেয় না। আমরা নির্দোষ। এইজন্য আমরা পালাইনি। ইংরেজ অফিসার বললে, তোমাকে টিলায় যেতে হবে। আমরা খোঁজ-খবর নেব। যদি তুমি নির্দোষ হও তো তোমার প্রাণের কোনো ভয় নেই। বাবামশায় বল্লেন, আমার সঙ্গে আমার বিবি ও একটি ছোট মেয়ে আছে। এখানে কোনো গাড়িঘোড়া নেই আর মেয়েদের পায়ে হাঁটা অভ্যাস নেই। ইংরেজ অফিসার জবাব দিল, এই যুদ্ধের মধ্যে আমরা তোমাদের জন্য কোনো গাড়ির ব্যবস্থা করতে পারব না। যদি তোমরা এখানেই থেকে যাও অন্য সেপাইরা এখানে আসবে এবং অজান্তে তোমাদের মেরে ফেলবে। তাই তোমার উচিত তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া। দুজন সেপাই তোমাদের সঙ্গে দেব আমরা। যদি পথে কোনো যান-বাহন পাওয়া যায় তাহলে তোমার স্ত্রী ও মেয়ে তাতে বসে যাবে নইলে এদের হেঁটেই যেতে হবে।

অগত্যা বাবামশাই যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিছু বহুমূল্য অলংকার ও মণিরত্ন সঙ্গে নিলেন, বাকি সমস্ত জিনিসপত্র বাড়িতে ফেলে রেখে সেপাইদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন। মা সব সময় অসুস্থ থাকতেন। দাদা আমাকে কোলে তুলে নেয়। বাবামশায় মার হাত ধরেন আর আমরা আমাদের বাড়ির দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাই—যে বাড়িতে আর কখনো ফিরে আসব না। আর হলও তাই, আর কখনো সেখানে আমরা ফিরে যাই নি।

যখন আমরা বাড়ি থেকে বের হই সেই ইংরেজ ও শিখ ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে চলে গেলেন আর দুজন শিখ ঘোড় সওয়ারকে আমাদের সঙ্গে টিলার দিকে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা ঘোড়া ছুটিয়ে অন্য কোনো দিকে চলে গেলেন। কেল্লার দরজা পর্যন্ত এই সওয়াররা আস্তে আস্তে চলতে থাকে এবং বাবামশায় ও মাকে তারা কিছু বলে না। মা চলতে পারছিলেন না, দশ পা গিয়েই বসে পড়ছিলেন আর তাঁর শরীর কাঁপছিল। যখন মা বসে পড়তেন সওয়াররাও থেমে যেত। কিন্তু যখন আমরা কেল্লার বাইরে পৌঁছে গেলাম সওয়াররা জবরদস্তি শুরু করলে। বলে, এমন করলে তো সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি চলতে পারো না? বাবামশায় বেশ নরমভাবে জবাব দিলেন, ভাই তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ যে সঙ্গে একটি অসুস্থ ও দুর্বল নারী—সারা জীবনে যে কখনো পায়ে হাঁটেনি। আমরা কোনো শয়তানি বা ধৃষ্টতা করছি না। বিবি ও বাচ্চার জন্যই আমরা

নাচার। সওয়াররা এ শুনে চুপ হয়ে গেল। কিন্তু আমার দাদার মুখ থেকে আচমকা বেরিয়ে এল, তোমরা তো আমাদের দেশের লোক, তোমাদের কি দয়া মায়া নেই? এ কথা শুনে একজন শিখ বলে, আমরা কি করি, হাকিমের হুকুম। দাদা বলে, হাকিম এ তো বলে নি যে আমাদের উপর জুলুম জবরদস্তি কর। শিখ সওয়ার বলে, কী জবরদস্তি করেছি আমরা? কিন্তু এবার একটু জবরদস্তি করতে হবে কেননা তোমরা ইচ্ছে করে যেতে দেরী করছ। এই বলে একজন সওয়ার আমাদের পিছনে চললো ও অন্যজন সামনে রইল। মা পেছনে ঘোড়া দেখে ঘাবড়ে গেলেন। তাঁর মৃগী রোগ ছিল তাই হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তিনি এলিয়ে পড়লেন ও হায় হায় শব্দ করতে লাগলেন। শিখ সওয়ার চুপচাপ দাঁড়িয়ে এই অবস্থা দেখে বাবামশায়কে বলে, আমি হেঁটে যাচ্ছি, তুমি এই অসুস্থ বিবিকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাও। শেষে বাবামশায় মাকে কোলে তুলে ঘোড়ায় চেপে চললেন। আর সেই বেচারা শিখ সওয়ার টিলা পর্যন্ত হেঁটে গেল। টিলার উপর ইংরেজ সৈন্য চারিদিকে শিবির ফেলেছে। আমাদেরও একদিকের তাঁবুতে থাকতে দেওয়া হল। সেই শিখ সওয়াররা লঙ্গরখানা থেকে আমাদের রুটি এনে দিল। সে রাত আমরা ঐ তাঁবুতেই কাটালাম।

পরদিন সকালবেলা ফৌজের জেনেরাল আমাদের সকলকে তার সামনে ডেকে পাঠালো। দিল্লীর একজন গোয়েন্দা সেই ইংরেজের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে জিজ্ঞেস করে, তুমি এদের চেনো? ও বলে, হ্যাঁ আমি চিনি। এরা বাদশার বংশের। লালকেল্লায় ইংরেজ মেয়ে মরদ বাচ্চাদের যে খুন করানো হয় তাতে এই লোকটার বিশেষ হাত ছিল। এই শুনে জেনেরাল বাবামশায়ের দিকে রাগী চোখে তাকান। বাবামশায় জবাব দিলেন, এ লোকটা মিথ্যে কথা বলছে। এ আগে আমার চাকর ছিল। চুরি করেছিল বলে একে আমি খুব মারধোর করে চাকরি থেকে বের করে দি। তাই শত্রুতা করে এ ধরনের কথা বলছে। আপনি ওকে শুধু এই জিজ্ঞেস করুন যে বাদশা বাহাদুরশাহ কতদিন থেকে আমার উপর অসন্তুষ্ট এবং সেলাম-ছুয়া কতদিন থেকে বন্ধ। গোয়েন্দা জবাব দিল, এ কথা ঠিক যে আমি এর চাকর ছিলাম কিন্তু এটা ভুল যে চুরি করার দরুন ইনি আমায় মার খাওয়ান। আমি নিজেই চাকরি ছেড়ে দি কেননা উনি মাইনে কম দিতেন। আর এও ঠিক যে বাদশা এর উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু সেপাই বিদ্রোহের সময়ে বাদশাকে খুশী করার জন্য তাঁর কাছে ইনি যাওয়া আসা শুরু করেন এবং যেদিন ইংরেজদের হত্যা করা হয় সেদিন যাঁরা ইংরেজ মেয়ে ও শিশুদের হত্যার বিরুদ্ধে ছিলেন তাঁদের উপর ইনি রাগ দেখাচ্ছিলেন এবং ওঁর ছেলেও ওঁর স্বপক্ষে ছিল। তাঁরা বলেছিলেন এ তো ইসলামের উপদেশের বিরুদ্ধে। তাতে এঁরা দুজন বলেন, সাপকে মেরে তার বাচ্চাকে ছেড়ে দেওয়া বুদ্ধির কাজ নয় এবং এদের বলাতেই ইংরেজ

শিশু ও নারীদের হত্যা করা হয়। শোনামাত্রই জেনেরাল রেগে লাল হয়ে গেল এবং বাবামশায়ের কোনো কথাই শুনতে চাইল না। যদিও তিনি ক্রমাগত বলতে থাকেন যে এ নিছক মিথ্যে কথা। কিন্তু জেনেরালের চোখ তখন রাগে লাল। কোনো কথা না শুনে সে হুকুম দিল, এখুনি এই দুজনকে গুলি মেরে উড়িয়ে দাও। তারপর বললে, এ দুজন আমাদের শিশু ও নারীদের হত্যা করিয়েছে কিন্তু আমরা এর উপর দয়া করছি। এর বিবি ও বাচ্চাকে ছেড়ে দিচ্ছি। এদের দুজনকে ছাউনি থেকে বের করে দাও। যেখানে ইচ্ছে হয় চলে যাক

গোরা ও দেশী সেপাইরা এগিয়ে এসে দাদা ও বাবামশায়ের হাত পিছমোড়া করে বাঁধল। বাবামশায় আমাকে দেখে কাঁদতে লাগলেন কিন্তু দাদা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। মামণি খুব জোরে চীৎকার করেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। বাবাকে জড়িয়ে ধরতে আমি ছুটে গেলাম কিন্তু একজন সেপাই আমাকে জোরে ধাক্কা দিল, আমি মামণির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ি। দেখলাম বাবামশায় ও দাদাকে সেপাইরা টানতে টানতে দূরে নিয়ে গেল। তাঁদের সামনে পাঁচ-ছয় জন সেপাই বন্দুক নিয়ে দাঁড়াল। তাদের কাছে জেনেরালও দাঁড়ায়। উঁচু আওয়াজে সে কিছু বলে যা আমি বুঝতে পারলুম না। এর পর সেপাইদের ইশারা করাতে তারা বুকের উপর বন্দুক রাখে আর বন্দুকের মুখ বাবা-মশায় ও দাদার দিকে নিবদ্ধ করে। সেই সময় বাবামশায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম, তিনি একবার আমার নাম নিয়ে ডাকলেন, বললেন, "শোন্ মা, আল্লাই ভরসা। আমরা দুনিয়া ছেড়ে চললাম।" তারপরে দাদার গলা শোনা গেল, "মা, মা, তোমার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া আমি সইতে পারব না। সেলাম, আমি মরছি।"

বন্দুকের শব্দ এলো আর রাশি রাশি ধোঁয়া। দেখলাম দাদা ও বাবামশায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। কাঁদছিলাম আমি। বুক ভয়ের চোটে দমে যাচ্ছিল। মার যখন একটু হুঁশ হল, বললাম, ওরা বাবা ও দাদাকে মেরে ফেলেছে। দেখো, এখনও ওরা মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। মাগো, ওদের বুক থেকে এখনও রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরুচ্ছে। এবার বাবা ও দাদা আমাদের ছেড়ে গেল। ওদের সঙ্গে আর কোনোদিন আমাদের দেখা হবে না। বাবা আমাকে ডাক দিয়েছিলেন আর দাদা তোমাকে। বল মা, এবার কি হবে? এরা কি আমাদেরও মেরে ফেলবে? এরা কি আমাদের বন্দী করে রাখবে? দুহাতে ভর দিয়ে মা উঠলেন। বাবা ও দাদার মৃতদেহ খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। মার ছটফটানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তিনি শিথিলভাবে বললেন, "আমার খোকন, আমার সোনা, আমার ষোলো বছরের গতর খাটুনি, আমার জীবনের শেষ ভরসা, আমার স্বামী আমায় ছেড়ে গেল, আমি নিঃশেষ হয়ে গেলাম। এই দুনিয়ায় আমার বলতে আর কেউ রইল না। ইয়া আল্লা! আমি দুনিয়াতে এসেছিলাম এ কি

স্বপ্ন, না সত্যিসত্যি আমার ঘাড়ে বিপদ নেমে এসেছে। মাথার মুকুটই আমার মাটিতে মিশে গেল, জোয়ান ছেলের সঙ্গে রক্তাক্ত পড়ে আছেন তিনি। গোয়েন্দা, তোকে যেন খোদা নেস্তনাবুদ করে দেয়। তুই বেবাক মিছে কথা বললি। এরা দুজন সেপাই বিদ্রোহ শুরু হওয়া থেকে শেষ পর্যন্ত বাড়ি থেকে বেরই হয়নি। আরে তুই কবেকার শোধ তুললি। আমার মত রুগী দুখিনীর উপরও তোর দয়া হল না। এই সাদাসিধে ছোট্ট মেয়েটার কথাও তোর মনে হল না আর আমাদের ওয়ারিসদের বিনা কারণে বিনা দোষে রক্তে ডুবিয়ে দিলি।"

মা যখন এইসব বলছিলেন দেশী বাহিনীর সেপাইরা এল। আমার ও মার হাত ধরে উঠিয়ে টানতে টানতে নিয়ে চলল। আমরা দুজন মৃতদেহের পাশ দিয়ে গেলাম। গুলি তাদের মাথায় ও বুকে লেগেছিল। রক্তে অনেক কিছুই চাপা পড়ে গিয়েছিল ও লাশ-দুটি নিস্পন্দ শুয়ে। সেপাই আমাদের টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। মা চলতে পারছিল না, আমিও না। কিন্তু তারা আমাদের ছাগলের মত টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। টিলার উপর পাথরে আমাদের পা রক্তাক্ত হয়ে গেল। বলতে পারব না যে কষ্টে আমরা সে সময় পড়েছিলাম দুনিয়াতে কেউ কি কখনো সেরকম কষ্টে পড়েছে।

সৈন্যদের ছাউনি থেকে বাইরে এনে সেপাইরা আমাদের ছেড়ে দিল। মা একেবারে বেহুঁশ পড়েছিলেন আর আমি তাঁর পাশে বসে কাঁদছিলাম। কিছুক্ষণ পরে একজন ঘেসেড়া ঘাসের বোঝা নিয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। আমার কাছে এসে মাথা থেকে বোঝা নামিয়ে মাকে দেখে বলে ওঠে, আরে এ মেয়েমানুষটা তো মারা গেছে। সে ছিল হিন্দু। আমাকে ওখানে ছেড়ে সে ছাউনিতে গেল আর সেখান থেকে দুতিন জন মুসল-মান ঘেসেড়েকে ডেকে নিয়ে এল। তারাও বললে, এ মেয়েলোকটি তো মারা গেছে। তারা আমার ও মার হাতের ও গলার গয়না খুলে নিয়ে বললে, মরদ মারা গেলে অনেক গয়নাপাতি পাওয়া গেছে কিন্তু সবই গেছে সরকারী খাজাঞ্চিখানায়। এতে কিন্তু আমা-দের দাবী। তারপর তারা একটি গর্ত খুঁড়ে মাকে মাটি চাপা দিল আর দুটো লোক আজ মেরী দরোজার দিকে আমাকে তুলে এনে ছেড়ে দিয়ে গেল। একা বসে-বসে কাঁদ-ছিলাম। খানিম বাজার থেকে একজন মুসলমান স্যাকরা বাড়ির মেয়েদের নিয়ে কুতুব সাহেব যাচ্ছিল। সে আমার কাছে এল। আমাকে সঙ্গে করে তারা কুতুব সাহেব নিয়ে গেল। যখন শহরে শান্তি ফিরে এল সেই মুসলমান স্যাকরাও দিল্লী ফিরে এল এবং আমার আত্মীয় যে কয়েকজন শাহজাদা ছিলেন তাঁদের হাতে আমাকে সঁপে দিল। তাদের কাছে থেকে আমি বড় হলাম। তাদেরই মধ্যে আমার বিয়ে হল এবং বিয়ের পরই পেনশন পেতে শুরু করলাম। খোদা আমাকে কয়েকটা বাচ্চা দিয়েছিলেন কিন্তু

কেউ বাঁচলো না। এমন কি স্বামীও মারা গেল। এখন বছর চারেক হতে চলল চোখও হারিয়ে ফেলেছি।

শুনলে মিয়াঁ দুখিনীর এই গাথা। আমার প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে হাহাকার ডুকরে ওঠে। এই দুনিয়াতে কেবল দশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি আরামের মুখ দেখেছি। আর সত্তর বছর ধরে শুধু কষ্ট ভোগ করছি। এখন কবরে পা ঝুলিয়ে বসে আছি। আজ মলেই কাল দ্বিতীয় দিন। ভাগ্যিস বেচারী বুড়ি ঠাকরুণকে পেয়ে গেছি। বাজার থেকে দরকারী জিনিসপত্তর নিয়ে আসে আর দিন-রাত কাছে বসে থাকে। আর আমরা দুজনে শেষ বয়সের দুঃখ-কষ্টে ভরা দিনগুলি মিলেমিশে কোনো রকমে কাটাচ্ছি।

4. নরগিস নজর

শাহজাদী নরগিস নজর ছিল বাহাদুরশা'র ছেলে মির্জা শাহ রুখের মেয়ে। 1857-র সেপাই বিদ্রোহের সময় তার বয়স ছিল সতেরো।

দিল্লীর লাল কেল্লায় দেওয়ান-এ-খাস ও মোতী মসজিদের পশ্চিমে গোরা ব্যারাকের পুবদিকে পাথরের পুকুর আছে একটা, যার মাঝখানে তৈরী করা হয়েছিল একটি সুন্দর মহল। তার উত্তর দিক থেকে একটা খাল বয়ে আসতো। ছিল শ্বেতপাথরের ঝিলমিলি ও চেরাগদান। তার উপর দিয়ে খালের জল বয়ে এসে পড়ত এই পুকুরে। মির্জা শাহ রুখ বাহাদুর থাকতেন এই জল-মহলে। তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন। এইজন্য মির্জা সাহেব নিজের মেয়ে নরগিস নজরকে খুব ভালবাসতেন।

জল মহলকে কাশ্মীরী শাল, তুরুক দেশের গালচে আর বেনারসী কাপড় দিয়ে সুন্দর-ভাবে সাজানো হয়েছিল। নরগিস নজরের খুব শখ ছিল মহলটাকে সাজিয়ে রাখার। তিনি ছিলেন এ ব্যাপারে বড়ই সুদক্ষ। পুরো কেল্লার সমস্ত মহল ও হাবেলীর মধ্যে তাঁর মহলটিকে সবচেয়ে সুন্দর ও সাজানো-গোছানো গণ্য করা হত।

নরগিস নজর সকালবেলা সূর্য ওঠার সঙ্গে উঠতেন। গরমকালে তার পালঙ আঙিনায় পাতা হত। শ্বেতপাথরের মেঝে। পালঙের পায়া ও চতরি ছিল সোনার ও তার উপর মণিমুক্তোর কাজ করা। রেশমী কাপড়ের সুন্দর মশারী। ভেতরে রাখা থাকত রেশমী বালিশ। শিয়রে থাকত চারটে নরম তুলতুলে বালিশ। শিয়রের বালিশ-গুলোর পাশেই থাকত দুটো ছোট ছোট গোলগাল বালিশ যাকে গাল-তাকিয়া বলা হত। এই বালিশগুলো ছিল গালের ঠেস দেওয়ার জন্য—যদি শাহজাদীর মাথা বালিশ থেকে নেমে যায় তাহলে তার গালকে কষ্ট পাওয়া থেকে বাঁচায় গালতাকিয়া। দুটো বড় বড় পাশ-বালিশ দুপাশে যাতে শাহজাদী সাহেবা হাঁটু দুটি আয়েশে রাখতে পারেন। রাতে যখন নরগিস নজর মশারীর মধ্যে ঢুকতেন তখন বকুল, জুঁই ও চাঁপা ফুল তার গাল-তাকিয়ার কাছে রাখা হতো যাতে রাতভোর তার সৌরভ শাহজাদীকে মাতিয়ে রাখে। যে মুহূর্তে নরগিস নজর মশারীর মধ্যে ঢুকতেন চারটে নাচুনে মেয়ে এসে হাজির হত সেখানে আর তারা খুব মৃদু স্বরে গান গাইত যতক্ষণ না শাহজাদী ঘুমিয়ে পড়তেন। আবার ভোরবেলায় সূর্য ওঠার আগে এই নাচিয়ে গাইয়ে মেয়েরা পালঙের পাশে এসে গান গাইত আর তার সুরেলা আওয়াজে শাহজাদী সাহেবা জেগে উঠতেন। ওঠবার পরেও শাহজাদী মশারীর মধ্যে বসে হাই তুলতেন, আড়ামোড়া ভাঙতেন আর মেয়েগুলো তাঁর সঙ্গে হাসি-তামাসার কথা বলত।

কেউ বলত, "ও হুজুর আপনার হাই পাচ্ছে. দাঁড়ান রুমাল ধরি। মুখটা ঢেকে নিন।"

অন্যটি বলত, "সরকার, আপনার আড়ামোড়া ভাঙা দেখবার জন্য পুকুরের মাছগুলো জলের উপর উঠে আসছে।" নরগিস নজর চোখ কচলে হেসে বলে, "যা পালা; মোলো যা, প্রত্যেক বার মড়িটা কেমন মিছে কথা শোনায়।" ছুকরী জবাব দেয়, "আমি মিছে কথা বলছি কি সত্যি আয়নাকে জিজ্ঞেস করুন না, সেও তো সামনে থেকে আপনাকে দেখছে। ওর মধ্যেও তো চুল ছড়িয়ে পড়েছে। সেও মেহেদী লাগানো লাল লাল আঙুল উঁচুতে উঠিয়ে হুজুরের আড়ামোড়া ভাঙার তারিফ করছে। ওখানেও দেখুন ও কেমন মাতোয়ারা হয়ে রয়েছে।"

তৃতীয় জন বলে "লাল লাল মেঘের মাঝখান থেকে সূর্যের কিরণগুলো এমনভাবে বেরিয়ে আসছে যেন আপনার লাল লাল ঠোঁটের মাঝখান থেকে ঝকঝকে শাদা দাঁত আর আপনার গাল দুটো যেন উষার আভা। চুল ছড়িয়ে মুখের উপর এসে পড়ায় মনে হচ্ছে যেন চতুর্দশীর চাঁদের উপর মেঘ ঘিরে এসেছে। কিন্তু জ্যোৎস্নার কাছে হার মেনে তার বুক ফেটে গেছে এবং চাঁদের চারদিকে তার হৃদয়ের টুকরোগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছে।"

এই সমস্ত কথাগুলো শুনে স্মিতমুখে নরগিস নজর মশারী থেকে বেরিয়ে আসেন। চৌকির উপর এসে বসেন। তারপর বাইরে গিয়ে খইল ও বেসম দিয়ে মুখ হাত ধোন। পোশাক বদলান, প্রাতরাশও হয়ে যায়। এর পর নিজেই গিয়ে বাড়ির সাজসজ্জা দেখতেন ও নিত্যি-নতুন আসবাবপত্র সাজানোর ধরন-ধারণ আবিষ্কার করতেন। দুপুরের খাওয়ার পর গান হত, সন্ধ্যায় ফুলবাগানে পায়চারির রেওয়াজ পুরো করা হত। রাত্রি ভোজনের বাহারই ছিল আলাদা। বাজনা বাজছে, গান গাওয়া হচ্ছে এবং মোসাহেবী মেয়েদের (সখীরা) সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া চলছে।

যে রাতে বাদশা বাহাদুরশাহ লালকেল্লা থেকে বেরিয়ে হুমায়ুনের মকবরায় গেলেন, সকলের আশংকা দৃঢ় হল যে সকালবেলা পর্যন্ত ইংরেজ দিল্লী জয় করে নেবে, নরগিস নজর নীরবে জল মহলের একধারে দাঁড়িয়ে চাঁদের আলো দেখছিলেন। তাঁর ছায়া পড়ছিল পুকুরের জলে এবং জলে নিজের ছায়া দেখে অদ্ভুত রকমের এক নেশা তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল।

হঠাৎ তাঁর বাবা মির্জা শাহ রুখ ভিতরে এলেন, বল্লেন, "নরগিস মামণি, আমি বাবা-মশায়ের (বাহাদুরশাহ) সঙ্গে যেতে চাই। তুমি এখুনি যাবে কি? তোমার জন্য যান-বাহনের বন্দোবস্ত করি। সকালবেলায় তুমি এসো।" নরগিস নজর বল্লে, "বাবা, আপনিও এখন যাবেন না। শেষরাতে আমার সঙ্গে চলবেন। ঠাকুরদা মশায়ের সঙ্গে যাওয়া আমি উচিত মনে করি না। ইংরেজ সৈন্য তাঁকে খুঁজবে এবং যারা তার সঙ্গে থাকবে তাদের

সবাইকে অপরাধী গণ্য করা হবে। এইজন্য ঠাকুরদা মশায়ের সঙ্গে হুমায়ুনের মকবরায় যাওয়া ঠিক হবে না। গাজীনগর (গাজিয়াবাদ) চলুন, সেখানে আমার ধাইমার বাড়ি এবং শুনেছি খুবই নিরাপদ ও ভালো জায়গা সেটা। ভোল বদলে যাওয়া উচিত। যখন এ আপদ-বালাই দূর হবে তখন এখানে ফিরে আসব।"

মির্জা বললেন, "বেশ, যেমন তোমার ইচ্ছে। গাজীনগর যাওয়ার জন্য রথের বন্দোবস্ত করি। তোমার সঙ্গে কে কে যাবে?"

নরগিস নজর জবাব দিলে, "কেউ না। শুধু একা যাব। কেননা চাকর-বাকর সঙ্গে নেওয়া ঠিক হবে না আর মনে হয় তারা যেতে রাজীও নয়।" একথা শুনে মির্জা বাইরে চলে গেলেন আর নরগিস নজর চাঁদের দিকে চোখ ফিরিয়ে পুকুরে চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখতে থাকেন।

কিছুক্ষণ পরে নরগিস নজর তাঁর চাকরানীদের ডাক দিলেন কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। জানতে পারা গেল সবাই পালিয়েছে এবং নরগিস নজর পুরো জলমহলে একা। প্রথম বারই এমনটি ঘটলো যে নরগিস নজর হুকুমের স্বরে ডাক দিলেন কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। ভয় পেয়ে নরগিস মহলের ভিতরে গেলেন। সমস্ত বাতি জ্বল'ছল কিন্তু কোথাও কেউ ছিল না। ভিতরে থাকতে নরগিসের ভয় হল, আবার তিনি বাইরে আঙিনায় বেরিয়ে এলেন। কেল্লার ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে শব্দ ভেসে আসছিল, মনে হচ্ছিল চারিদিকে লোক ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে নরগিস নজর তাঁর বাবার পথ চেয়ে বসে রইলেন, কিন্তু তিনি এলেন না। উতলা হয়ে নরগিস কান্নায় ভেঙে পড়লেন। রাত দুটোর সময় একজন খোজা এসে বললে, "সাহবে আলম (মির্জা শাহ রুখ) বলেছেন, ইংরেজের গোয়েন্দারা খোঁজে কেল্লার ভিতরে ও বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে আমি তোমার সঙ্গে গাজীনগর যেতে পারব না। যান-বাহনের বন্দোবস্ত করে দিয়েছি। তুমি খোজার সঙ্গে চলে যেও আর আমি ভোল বদলে কোথাও চলে যাচ্ছি।"

নরগিস নজর ব্যাকুল হয়ে বলেন, "কোথায় যাওয়া ঠিক করেছেন?" খোজা বললে, "আমি জানি না।" নরগিস নজর হুকুমের সুরে বললেন, "যা, গিয়ে জেনে আয়, বাবা-মশায় কোথায় যাবেন? তিনি ভোল বদলে আমার সঙ্গে গাজীনগর কেন যাচ্ছেন না?"

খোজা তখুনি ফিরে যায় ও নরগিস নজর আঙিনায় পায়চারি করেন। কিছুক্ষণ পরে খোজা ফিরে আসে ও বলে, "বাবামশায় সহিসের পোশাক পরে কেল্লা থেকে বেরিয়ে গেছেন আর কেউ জানে না যে কোথায় গেছেন। আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য রথ প্রস্তুত।" কান্না পেয়ে গেল নরগিস নজরের। জীবনে এই প্রথম বার নিরুপায় অসহায় অবস্থায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। তিনি গয়নার বাক্স ও কিছু দরকারী কাপড়-চোপড় সঙ্গে নিলেন যা খোজা নিজের হাতে উঠিয়ে নিল ও তিনি জলমহল থেকে বেরিয়ে

এলেন। রথে বসবার আগে তিনি একবার পিছন ফিরে জলমহল ও তার সাজ-সজ্জার দিকে তাকালেন, বললেন, তোকে আবার দেখা ভাগ্যে আছে কিনা কে জানে। হয়তো চিরদিনের জন্যই তোর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

রাত তিনটে বেজে গেছে। নরগিস নজর রথে বসে গাজীনগরের দিকে যাচ্ছেন। সকাল আটটায় সেখানে পৌছে গেলেন। পথে অনেক লোকের আনাগোনা সত্ত্বেও কেউ তাঁর রথ থামায়নি। গাজীনগরে নরগিস নজরের ধাইমার বাড়ি খুবই প্রসিদ্ধ। যে মুহূর্তে নরগিস নজর ধাইমার বাড়ির সামনে রথ থেকে নামেন ধাইমা ছুটে আসে এবং দুহাত বাড়িয়ে শাহজাদীর আলাই-বালাই নিজের ঘাড়ে নিয়ে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসায়। সাধ্যাতীত আদর-আপ্যায়ন করে।

দু-তিন দিন নরগিস নজর ধাইমার বাড়িতে দিব্যি আরামে কাটালেন। হঠাৎ খবর ছড়িয়ে পড়ল যে বাদশা ধরা পড়েছেন ও শাহজাদাদের হত্যা করা হয়েছে। সৈন্য গাজিয়াবাদ লুঠ করতে আসছে। ধাইমাকে বলে কয়ে নরগিস নজর গয়নার বাক্সটা মাটিতে পুঁতে ফেললেন আর বিপদের প্রতীক্ষায় থাকলেন।

অল্প কিছুক্ষণ পরে শিখ সেনা গাজিয়াবাদে প্রবেশ করে বিদ্রোহীদের খুঁজতে শুরু করে দেয়। গুপ্তচররা বলে দেয় বাদশার নাতনী তার ধাইমার বাড়িতে আছে। দুজন শিখ সর্দার চারজন সেপাই নিয়ে ধাইমার বাড়িতে এসে ধাইমা ও তার বাড়ির সবাইকে গ্রেপ্তার করে নেয়। নরগিস নজর একটি কুঠরিতে লুকিয়ে ছিলেন। কিন্তু দরজা ভেঙে তাঁকেও বের করে বিনা পর্দায় সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। সর্দার জিজ্ঞাসা করে, "তুমি বাহাদুরশা'র নাতনী?" নরগিস নজর বলেন, "আমি একজন লোকের মেয়ে। বাদশার মেয়ে হলে এ গরীবের বাড়ীতে কেন আসব? যদি খোদা আমাকে বাদশার নাতনী করতেন তাহলে তোমরা বিনা পর্দায় এভাবে সবার সামনে দাঁড় করাতে না। তোমাদের লজ্জা করে না নিজের দেশের মেয়েদের উপর জুলুম করতে?" সর্দার বলে, "আমরা কোন্ জুলুমটা করলাম? আমরা শুধু জানতে চেয়েছি তুমি কে? আমরা শুনেছি যে তুমি বাহাদুরশার নাতনী আর তোমার বাবা কেল্লার মধ্যে অনেক ইংরেজ মেয়ে ও শিশুদের হত্যা করেছে।" নরগিস নজর বলেন, "যে করে সেই তার ফল পায়। যদি আমার বাবা এমন কাজ করে থাকেন তাহলে তাঁকেই জিজ্ঞাসা কর। আমি কোনো জুলুম করিনি। আমি কাউকে মারিনি।"

এই শুনে অন্য শিখ যুবক সর্দার বলে ওঠে, "হ্যা, তুমি তো চাউনি দিয়েই কোতল করছ। তলোয়ার বা হাতিয়ার দিয়ে মারবার দরকার কি তোমার।"

যদিও জীবনে পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলা এই প্রথম তবুও বেশ সাহসের সঙ্গে নরগিস নজর জবাব দেন, "চুপ কর। বাদশা ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে এরকম বেআদপের মত

কথা বলতে নেই। তোমার জিভ ছিঁড়ে ফেলা হবে।" যুবক সর্দার এ শুনে ভীষণ ক্ষেপে গেল, এগিয়ে এসে নরগিস নজরের চুলের গোছা ধরে টান দেয়। বুড়ো শিখ সর্দার যুবক সর্দারকে বাধা দেয় ও বলে মেয়েদের সঙ্গে এমন বাড়াবাড়ি করা উচিত নয়। এ শুনে যুবক সর্দার চুলের গোছা ছেড়ে দেয়। একটা ভাড়াটে গরুর গাড়ি আনিয়ে তাতে নরগিস নজরকে বসানো হয়। ধাইমা ও তার বাড়ির সবাই বন্দী হয়ে সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলে। নরগিস নজরকে জিজ্ঞেস করা হয়, "তোমার গয়না-গাঁটি টাকা পয়সা কোথায়?" তিনি বলেন, "আমি নিজেই গয়না, বুঝদারের জন্য আমিই মণিমুক্তো আমিই ধনদৌলত। আমার কাছে আর কিছুই নেই।"

এই শুনে দুই সর্দারই চুপ করে যায় আর গরুর গাড়ি দিল্লীর দিকে যাত্রা করে।

হিণ্ডন নদীর কাছে গাঁয়ের জাঠ ও গুজররা শিখ সৈনিকদের উপর বন্দুক নিয়ে আক্রমণ করে এবং অনেকক্ষণ ধরে লড়াই চলে। সংখ্যায় শিখরা ছিল কম ও গাঁয়ের লোক বেশী। তাই সমস্ত শিখ মারা পড়ল আর গাঁয়ের লোকেরা বন্দীদের সঙ্গে করে গাঁয়ে নিয়ে গেল।

নরগিস নজরের গায়ে যে দুচারটে গয়না ছিল তা এই গেঁয়ো লোকেরা খুলে নিল আর দামী কাপড়-চোপড় সব কেড়ে নিল। কোনো চামারনীর ছেঁড়া ঘাঘরা, কুর্তা ও ময়লা দোপাট্টা পরতে দিল। কেঁদে কেঁদে নরগিস নজরের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়লো কিন্তু শরীর ঢাকবার জন্য এই কাপড় পরতে বাধ্য হলেন। কিছুক্ষণ পরে পাশের গাঁ থেকে কিছু মুসলমান গেঁয়ো লোকরা আসে। তাদের মোড়ল নরগিস নজরকে গুজরদের কাছ থেকে কিনে নিজের গাঁয়ে নিয়ে যায়। এরা ছিল জাতে রাঙ্গড় আর কিছু ছিল তগা জাতের মুসলমান। মোড়ল তার ছেলের পক্ষ থেকে খবর পাঠালো ওর সঙ্গে তোমার বিয়ে দি। মোড়ল ছিল বুড়ো তার ছেলে যদিও গেঁয়ো তবে দেখতে শুনতে বেশ ভালই ছিল। নরগিস নজর হ্যাঁ করাতে কাজী তাদের নিকে করিয়ে দিল। নরগিস নজর তিন চার মাস মোড়লের বাড়িতে নতুন বউ হয়ে বেশ আরামেই দিন কাটালেন।

ইংরেজদের দখল পুরোপুরি কায়েম হয়ে গেছে আর তাদের গোয়েন্দা জায়গায় জায়গায় ঘুরে খবরাখবর জোগাড় করছে। একজন গোয়েন্দা দিল্লীর হাকিমকে খবর দিল যে মির্জা বাগী (বিদ্রোহী) কে তো পাওয়া গেল না কিন্তু তার মেয়ে অমুক গাঁয়ে অমুক মোড়লের বাড়িতে আছে। ইংরেজ হাকিমের হুকুমে ঐ গাঁয়ে পুলিশ গেল। মীরাটের পুলিশ এসে গাঁ ঘিরে ফেললে। নরগিস নজর, তাঁর স্বামী ও শ্বশুরকে ধরে দিল্লী নিয়ে যাওয়া হল। হাকিম নরগিস নজরকে মির্জার বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করলেন কিন্তু যখন কোনো দরকারী খবর পেলেন না তখন হুকুম দিলেন মনে হচ্ছে মোড়ল ও তার ছেলে বিদ্রোহী আর এরা দুজন বিদ্রোহীর মেয়েকে ঠাঁই দিয়েছে সুতরাং এদের দুজনকে জেলে পাঠিয়ে দাও আর এই মেয়েটিকে দিল্লীর কোনো মুসলমানের হাতে সঁপে দেওয়া

হোক। এইভাবে মোড়ল ও তার ছেলেকে দশ-দশ বছরের জন্য জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। নরগিস নজরকে জিজ্ঞাসা করা হল তিনি কার কাছে থাকতে চান? শাহজাদী জবাব দেন, যদি আমাদের বংশের কেউ দিল্লীতে থাকে তাহলে তার কাছে যেন আমাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জানা গেল তৈমুর বংশের লোকরা এখনো লুকিয়ে রয়েছে — বনে জঙ্গলে বা গ্রামে বাস করছে। দিল্লীতে এখনো কেউ ফেরেনি। অতএব নরগিস নজরকে একজন মুসলমান সেপাইয়ের হাতে সঁপে দেওয়া হল। সে তাঁকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। সেপাইটার বাড়িতে বউ বর্তমান, যখন সে দেখলে যে সেপাই একটা সুন্দরী যুবতী মেয়ে নিয়ে এসেছে, জোড়াহাতে তাকে মার দিল আর নরগিস নজরকেও ধাক্কা মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিল।

এই প্রথমবার জীবনে কেউ নরগিস নজরকে ধাক্কা মারলে। সেপাই নরগিস নজরকে নিয়ে তার এক বন্ধুর বাড়িতে গেল। তিনি ছিলেন বৃদ্ধ বয়সের মুসলমান ও বাড়িতে একা থাকতেন। শাহজাদীর অবস্থার কথা শুনে তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং খুব আদর করে তাঁকে বাড়িতে ঠাঁই দিলেন। এক রাত্রি নরগিস নজর এ বাড়িতে স্বস্তিতে কাটালেন।

দ্বিতীয় রাত্রিতে নরগিস নজর যখন ঘুমোচ্ছিলেন কিছু লোক হাত দিয়ে তাঁর মুখ চেপে ধরে তুলে নিয়ে গেল। নরগিস নজর খুব হাত পা ছুঁড়লেন কিন্তু তারা এত চেপে ধরেছিল যে বেচারী একটুও নড়তে চড়তে পারলেন না। এই লোকগুলো ছিল সেই গাঁয়ের যেখানকার মোড়লের ছেলের সঙ্গে নরগিস নজরের নিকে হয়েছিল। কিন্তু তারা তাঁকে দিল্লীর কাছের একটি গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে একটি কুঁড়েঘরে নামাল আর শোবার জন্য একটা চারপাই দিল। তগা মুসলমানদেরই গাঁ ছিল এটা।

নরগিস যে বাড়িতে থাকতেন সেটা মোড়লেরই বাড়ি। তিনচার বছর নরগিস নজর এই বাড়িতেই কাটালেন। ঘরকন্নার সব কাজই তিনি করতেন যদিও শিখতে পারলেন না গোবর ঘাটা ও দুধ দোওয়া।

চার বছর পরে তাঁর স্বামী জেল থেকে মুক্তি পেল। মেয়াদ পুরো হওয়ার আগেই সরকার তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। সে নরগিস নজরকে এ-গাঁ থেকে নিজের গাঁয়ে নিয়ে গেল। সেখানেই তিনি সারাজীবন কাটিয়ে দেন। কয়েকটি বাচ্চা হয়েছিল তাঁর। 1911 সালে নরগিস নজর মারা যান।

নরগিস নজর বলতেন, "যখন আমি দিল্লীর কাছে-পিঠে তগা মোড়লের বাড়িতে থাকতুম তখনকার কথা বলছি। বর্ষাকাল, মেঘ ডাকছে বিজুরী চমকাচ্ছে আর আমি আমার চালাঘরে মোটা খদ্দরের একটি চাদর মুড়ি দিয়ে খসখসে চারপাইয়ের উপর শুয়ে। স্বপ্নে দেখলাম, মহলের মণিমুক্তো জড়িত সোনার পালঙে শুয়ে আছি। জুঁই,

চাঁপা ও বকুল ফুল আর রেশমী বালিশগুলো আমার কাছে, গাইয়ে মেয়েগুলো গান গাইছে মৃদু স্বরে আর আমি উপভোগ করছি এক অনির্বচনীয় পুলক। এই স্বপ্নাবস্থাতেই একজন গায়িকাকে হুকুম দি, মশারীর পর্দা ওঠা ও আমাকে তুলে বসিয়ে দে। দেখলাম, সে ছুটে এল আমাকে কোলে করে ওঠাল আর বাড়াবাড়ি করে আমার গা একটু টিপে দিল। আমি তাকে এক চড় মারি, সে জোরে হেসে ওঠাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। ভীষণ অন্ধকার। এই স্বপ্ন ও জলমহলের স্মৃতি আমাকে ব্যাকুল করে তোলে। মোটা খদ্দরের চাদর গায়ে জড়িয়ে কুঁড়েঘরের দরজায় এসে দাঁড়াই। খুব জোরে বৃষ্টি পড়ছিল, বিদ্যুৎ চমকালে উঠোনে জমা জল দেখা যাচ্ছিল আর আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি জলমহলের আঙিনায় দাঁড়িয়ে চাঁদ ও পুকুরের জলেতে তার ছায়ার খেলা দেখছি।

"যবে থেকে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়েছি আমি একটুও উদ্বিগ্ন বোধ করিনি বা কখনো ভাল দিনগুলির কথা মনে করিনি। কিন্তু জানি না আজ কি ব্যাপার বারে বারে জলমহল মনে পড়ছে আর এও মনে আসছে যে আমি ভারত সম্রাটের নাতনী আর বাবার আদরী মেয়ে। আর এও মনে পড়ছে যে সতেরো বছর পর্যন্ত আমি ছিলাম শাহজাদী আর আজ একটা গরীব কাঙাল চাকরানী। সারা কেল্লার মধ্যে আমার বাড়িতে ছিল সবচেয়ে ভাল ও সুন্দর কাপড়-চোপড় আর সব কিছুই খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হত। তাই আমার রাতদিনের শখ ছিল। কিন্তু আজ সব কিছুই উল্টে গেছে। ধাইমার বাড়িতে যে গয়না ও মণিমুক্তো পুঁতে রেখেছিলাম পরে গোপনে সেখানে খুঁড়ে দেখা গেল সব কিছুই অদৃশ্য। কে জানে কে নিয়ে গেল। বিগত যুগের কোনো জিনিসই আর রইল না। শুধু আমিই রইলাম পড়ে আর তাও কিনা বদলে যাওয়া ও সবরকমে নিঃস্ব।

"এই সব চিন্তা ভাবনার এত বেশী প্রভাব পড়ল আমার উপর যে মাথা ঘুরে উঠল আর আমি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম। সকাল অব্দি জ্ঞান ফেরেনি। সকাল হল, দেখলাম, আমি তেমনি রয়ে গেছি যাকে সবাই নস্ত বলে ডাকে, উনুনটাও সেই যাতে আমি রুটি সেঁকতাম আর সেই বাড়ির সব কাজকর্মও ছিল যা আমাকে আমার বাঁদীদের চেয়ে বেশী খেটে করতে হত। তাই আমি বলতাম, যা দেখেছিলাম তা ছিল স্বপ্ন আর যা শুনি তা হল গল্প. ... ."

5. মহ জমাল

"দিলশাদ, সুড়সুড়ি দিস না, ঘুমোতে দে। নামাজ কামাই গেলে কি করি। ইচ্ছেই করছে না চোখ খুলতে।"

"ওগো সুড়সুড়ি আমি দিইনি। এই গোলাপ ফুলটা তোমার পায়ের তলায় চোখ কচলাচ্ছে।"

"এই ফুলটা আমি দলে-পিষে-চটকে ফেলব। এত ভোরে কেন জাগাস আমায়? এখনো আমার ঘুমোতে ইচ্ছে করছে। সুন্দরীকে ডেকে দে একটু। বাঁশী বাজিয়ে হালকা সুরে আমাকে ভৈরবী শোনাক। গুলচমন কোথায়, হাত-পা টিপুক। তুই একটা গল্প বল।"

"গল্প শোনালে পথিক পথ ভুলবে। দিনের বেলা গল্প বলা উচিত নয়। সুন্দরী এসে গেছে। গুলচমনকে ডাকছি। আম্মা জানতে পারলে ভীষণ রাগ করবেন যে এখনও মহ জমালকে জাগাইনি। নামাজের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।"

সুন্দরী বাঁশী বাজাতে জমাল চোখ খোলে। চুলগুলো জড়ো করে হাসে তারপর কলমা পড়ে। নরগিস সেলাম করে। জবাবে জমাল তাকে একটা চিমটি কাটে। আড়া-মোড়া ভেঙে উঠে বসে ও বলে, "দিলশাদ, আমি নরগিসকে চিমটি কাটলুম তো ও হাসল না কেন? মুখ কোঁচকাল। আয়, তুই আয়। তোর কান মলে দি আর তুই খুব হাস।"

দিলশাদ উঠে পালায়, দূরে গিয়ে দাঁড়ায় আর বলে, "এই নিন আমি খিলখিল করে হাসছি। আপনি ধরে নিন যে কান মলে দিয়েছেন।"

মহ জমাল আবার আড়ামোড়া ভাঙে আর হাসতে হাসতে গিয়ে চৌকির উপর বসে পড়ে। উজু (প্রার্থনা করার পূর্বে শুচিতার জন্য হাত পা ধোয়া) করে। নামাজ পড়ে। উঠোনে বেরিয়ে আসে এবং বাগানের একটেরে একটি চৌকিতে বসে। কোরাণ শরীফ পড়তে শুরু করে। সমস্ত দাসী বাঁদী বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে লেগে যায়। প্রাতরাশ তৈরি হয়।

মহ জমালের কোরাণ শরীফ পড়া যখন শেষ হয় মালিনী বাঁশের তৈরি একটা ডালায় কাঁচা লংকা নিয়ে পৌঁছোয়। প্রথমে সে মহ জমালের আলাই-বালাই নেয়, আশীর্বাদ দেয় পরে বলে, "সরকার আজ আপনার পোঁতা গাছে এই লংকা ফলেছে। আপনাকে ভেট করতে এসেছি।"

ডালাটা মহ জমাল হাতে নেয়। সমস্ত চাকরানীদের ডাকা হয় এবং লংকার আবির্ভাবে সারা মহলে ধুম পড়ে যায়। নরগিস বলে, "কেমন সবুজ স্নিগ্ধ রূপ।" দিলশাদ বলে "যেমন মালকিনের গাল।" সুন্দরী বলে, "কেমন চুপচাপ শুয়ে আছে যেমন মালকিন পালঙে শুয়ে থাকেন।" গুলচমন বলে, "ডাল থেকে খসেছে, ঘর থেকে ছাড়াছাড়ি তাই এত চুপচাপ।"

মহ জমাল বলে, "মালিনীকে পোশাকের জোড়া দাও আর কাপড় পরাও। নগদ পাঁচটা টাকাও দিও। আমার চারাগাছের প্রথম ফল ও এনেছে, ওকে মুখমিষ্টি করিয়ে দাও।"

মালিনী পায় রেশমী পোশাকের জোড়া। রুপোর খাড়ু পরানো হয়। লাড্ডু খাওয়ানো হয়। পাঁচ টাকা নগদ ও একটা পানের খিলি পায়। দোয়া দিতে দিতে সে বাড়ি যায়। ওদিকে আম্মাকে গিয়ে দাসী খবর দেয় যে মালকিনের গাছে প্রথম ফল ধরেছে। তিনি পাশের বাড়ি থেকে এলেন। সঙ্গে উঁচু শ্রেণীর মোগলানী দাসী। এসে মেয়ের আলাই বালাই নিলেন। মহ জমাল আদাব করলে। আম্মা ও মোগলানী লংকার খুব প্রশংসা করলেন। অনেকক্ষণ ধরে বাড়িতে লংকার চর্চা চলতে থাকে।

মহ জমাল খুরশীদ জমালের একমাত্র কন্যা। তার বাবা মির্জা আলি গওহর ওরফে নীলী শাহ আলমের ছেলে আকবর শাহ সানীর (দ্বিতীয়) ভাই যিনি মারা গিয়েছিলেন। খবাসদের (বিশিষ্ট বাঁদী) পেটে তাঁর কয়েকটি সন্তান হয় কিন্তু বেগমের গর্ভে শুধু একটি মেয়ে এই মহ জমাল জন্ম নেয়, তাও বুড়ো বয়সে। যখন মির্জা নীলী মারা যান মহ জমালের বয়স মাত্র পাঁচ বছর। এখন সে পনেরোতে পড়েছে। শ্যামলা রং, লম্বাটে মুখ, মাঝারি গড়ন; কালো চোখে রসালো মাদকতা, স্বরে এক ধরনের অনুভূতিপ্রবণতা। হেসে যখন কথা বলে, মনে হয় যেন মর্সিয়া (কেউ মরে যাবার পর তার বিষয়ে লেখা গয় কবিতা) পড়া হচ্ছে শুনে বুকে ব্যথা লাগে। খুবই চঞ্চল, দুষ্টু, আরামপ্রিয় কিন্তু মৃদুস্বভাবের। আদরে সোহাগে প্রতিপালিত। শাহজাদী। পিতৃহীনা একমাত্র মেয়ে। স্বভাবে একটু একরোখা ও জেদী। রোগা-পটকা শরীর। চলার সময় অস্বাভাবিকভাবে সামনে নুয়ে চলে ফুলভরা ডালের মত এদিক-ওদিক দুলে দুলে হাঁটে। পদে পদে হোঁচট খায়। দাসীরা সঙ্গে সঙ্গে দৌড়োয়। বিসমিল্লাহ বা আল্লার দয়া বলতে বলতে চলে।

ফুলআলাদের উৎসব। বাহাদুরশাহ তাঁর নতুন জফর মহলে থাকতেন যা খোয়াজা কুতুব সাহেবের দরজার কাছে তৈরি করা হয়েছিল। বেগমরা অন্দর মহলে। কিন্তু খুরশীদ জমাল ও মহ জমাল অন্য বাড়ি নিয়েছিলেন। কেননা মির্জা নীলীর সময় থেকেই বাহাদুরশার সঙ্গে তাঁদের বনিবনা ছিল না। বাহাদুরশাহকে ইংরেজরা মাসিক একলাখ টাকা

দিত। তা থেকে প্রতিমাসে একহাজার টাকা আলাদাভাবে খুরশীদ জমালকে পাঠিয়ে দেওয়া হত। দিনকাল ছিল শস্তার। হাজার টাকা আজকালকার একলাখ টাকার সমান। খুরশীদ জমাল ঐশ্বর্যের মধ্যে দিব্যি সুখে জীবন যাপন করছিলেন। যেদিন সন্ধ্যায় পাংখা ওঠানো হয় (বৃহদাকার ব্যজনী দিয়ে কোনো উৎসব) সেদিন মহ জমাল বিকেলবেলা বারান্দায় চিকের আড়ালে বসেছিল। বাইরে শানাই বাজছে। দিল্লীর হিন্দু-মুসলমান রংবেরঙের কাপড়-চোপড় পরে পাংখার সঙ্গে সঙ্গে চলছে। দোকানপাট সাজানো গোছানো। সক্কারা (কোমরে মশক বওয়া ভিস্তী) বাটি বাজাচ্ছে।

মগরিবের (সান্ধ্য নামাজ) সময় হলে খুরশীদ জমাল বাঁদীদের দিয়ে বলে পাঠালেন যে আগে গিয়ে নামাজ পড়ে নাও তারপর তামাশা দেখখন। মহ জমাল ওঠে, যাওয়ার সময় দেখতে পায় একজন ফকির শাদা কফনী (এক রকমের কাপড় যা গলা থেকে পা পর্যন্ত পরা হয়) পরে, ফ্যাকাশে মুখ, আঢাকা মাথা, খালি পা পাংখার পাশ দিয়ে হেঁটে তাকে দেখতে দেখতে চলে গেল। তার চেহারা ও কফনী দেখে মহ জমাল ভয় পেয়ে গেল। নামাজের সময়েও মাথার মধ্যে তাই ঘুরতে থাকে। তামাশা দেখা মিটে গেলে ঘুমোতে যায় কিন্তু রাতেও কয়েকবার কফনী দেখা দিল। ভোর হল। হাল্‌কা জ্বর। মার কাছে খবর গেল। তিনি কোনো মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলেন, সিন্দুক থেকে একটা তাবিজ বের করে গলায় পরিয়ে দিলেন। ফকিরদের জন্য ভিক্ষা পাঠিয়ে দিলেন।

দুপুরবেলা জ্বর বাড়ল। মহ জমাল বারে বারে চমকে চমকে ওঠে ও বলে, ওই বুঝি কফনীআলা এল। সে আমাকে ডাকছে। মাগো, এদিকে এস, ঐ ত্থাখো দাঁড়িয়ে হাসছে।

মা দাসীদের কাছে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলে, "একজন ফকির সন্ধ্যে বেলা কফনী পরে যাচ্ছিল। মালকিন নামাজের জন্য যখন ওঠেন তখন চিকটা একটু সরে যায়। ফকির ওঁর দিকে কুটিল চাউনিতে দেখে। তারপর সে কোথাও চলে যায়।"

খুরশীদ জমাল চাকরদের হুকুম দিলেন, ঐরকম পোশাকপরা ফকির যেখানে পাও নিয়ে এস। চাকররা সারা মেলায় খুঁজে বেড়ায়। সন্ধ্যে হয় হয় তখন সেই ফকিরকে পাওয়া গেল। খুরশীদ জমাল তাকে পর্দার পাশে বসিয়ে মেয়ের হালচাল শোনালেন। সে বল্লে, "আমাকে ভিতরে নিয়ে চল। আমি মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিলেই ও ভাল হয়ে যাবে।"

খুরশীদ জমাল ভিতরে পর্দা করালেন। ফকিরকে পালঙের পাশে নিয়ে গেলেন। সে দুটো চোখ বন্ধ করে দুই গালে নিজের হাত রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল খানিক। তারপর বললে, "এই যে তোমার মেয়ে ভাল হয়ে গেছে।"

দেখা গেল সত্যি জ্বর নেমে গেছে। মহ জমাল উঠে বসে। খুরশীদ জমাল ও বাঁদীরা

সবাই অবাক। ফকিরকে বসান হল। কিছু টাকা ও দুই থান কাপড় ভেট করা হল। ফকির বলে, "এ আমি নিই না। আমাকে মেয়ের মুখ দেখিয়ে দাও। নইলে আবার অসুখে পড়বে।"

প্রথমে খুরশীদ জমাল কিছুটা ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু মনে পড়লো, ফকিরকে তো বাপের সমান মানা হয়। পর্দা সরানো হল। মহ জমাল ফকিরকে দেখলেন ও মাথা নিচু করে নিলেন। ফকির মহ জমালকে দেখে, ঠায় দেখতেই থাকে। কিছুক্ষণ পরে 'ভালো হোক বাবা' বলে উঠে দাঁড়ায় ও চলে যায়।

সে ছিল তিরিশ বছরের যুবক। কিন্তু অসুস্থ মনে হচ্ছিল। মুখ অত্যধিক ফ্যাকাশে। শাদা কফনী ছাড়া অন্য কোনো কাপড় ছিল না। মনে হচ্ছিল চোখ দুটো যেন কাঁদতে কাঁদতে ফুলে উঠেছে।

এই যুবকটা সেই মালিনীর ছেলে যে মহ জমালের বাগানের দেখাশুনো করত। বছরখানেক আগে সে মহ জমালকে বাগানে দেখেছিল। মহ জমালকে দেখে আপনা আপনি তার মধ্যে যে কষ্টের শুরু, নিজের দারিদ্র্য ও মহ জমালের মর্যাদার কথা ভেবে তা কাউকে বলার সাহস হত না তার।

ছমাস ধরে সে এই ভজোকটোতে অশান্তি ভোগ করল। তারপর সে দেখা পেল এক হিন্দু যোগীর। তার কাছে সে তার মনের কথা বলল। যোগী তাকে একটি শাদা কফনী দিয়ে বললেন, এটা পরলেই তার সব কাজ সফল হবে। কফনী পরা মাত্রই সে নীম মজবুব (যে পাগলা আবোল তাবোল বকে) হয়ে গেল। বাড়ি ছেড়ে বনে চলে গেল। ছমাস জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াল। ছমাস পরে সে যখন লোকালয়ে ফিরে এল তার দেখা হল মহ জমালের সঙ্গে। কিন্তু এখন তার চাউনিতে সেই শক্তি যা এক নজরেই মহ জমালকে অসুস্থ করে দিল।

14 সেপ্টেম্বর 1857। একটি রথ নজফগড়ের কাছে দাঁড়িয়ে। খাকি উর্দি পরা কিছু সেপাই সেটা ঘিরে রয়েছে। এরা সবাই সৈন্যদলের সেপাই। এই রথে খুরশীদ জমাল, মহ জমাল ও দুটি বাঁদী বসে। বাইরে চারজন চাকর তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে। সেপাইরা বলছিল, আমরা রথের ভেতরে তল্লাসী নেব। এতে কোনো বিদ্রোহী লুকিয়ে আছে। বেগমের চাকররা বলছিল, ভিতরে শুধু মেয়েরা আছে তাই আমরা পর্দা ওঠাতে দেব না। কথার পিঠে কথা থেকে লড়াই লেগে গেল। চাকররা তলোয়ার চালাতে শুরু করে এবং এমন লড়াই লড়ল তারা যে কেউ আর বেঁচে রইল না। সেপাইরা রথের পর্দা তুলে দিল। মেয়েদের দেখল আর গয়নার বাক্স তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিল। এ ছাড়াও আরো যত জিনিস ছিল লুঠ করে নিয়ে গেল। রথচালক পালিয়ে গিয়েছিল। বাঁদীদের নিয়ে বেগম নজফগড়ের দিকে যাবেন এমন সময় কতকগুলো গুজর এসে তাঁদের কাছে

গয়না ও কাপড় চাইল। বেগম বললেন, আমাদের যথাসর্বস্ব সৈন্যের লোকেরা লুঠ করে নিয়ে গেছে। এখন আমাদের কাছে কিছুই নেই। তোমরা রথ ও বলদ নিয়ে যাও। কিন্তু গুজররা কোনো কথাই শুনল না, তারা জবরদস্তি তাদের বোরখা খুলে ফেলে সমস্ত বাড়তি কাপড় চোপড় ছিনিয়ে নিল। খুরশীদ জমাল ও তাঁর বাঁদীদের গালমন্দ করতে শুরু করে তারা। একজন খুরশীদ জমালের মাথায় মারল এক লাঠি আর অন্যরা বাঁদীদের উপর লাঠি চালাতে লাগল। মহ জমাল ভয়ে জড়সড় হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তাকে কেউ কিছু বলে না। খুরশীদ জমালের মাথা ফেটে চৌচির, কাতরাতে কাতরাতে মারা গেলেন তিনি। দুটো বাঁদীও বাঁচলো না বেদম প্রহার থেকে। মহ জমাল একা দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখলে। মাকে মরতে দেখে তাঁকে জড়িয়ে সে কাঁদতে থাকে। গুজররা মারপিট করে চলে গিয়েছিল। মহ জমাল কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে। জ্ঞান হলে সে দেখলে, সেখানে না তার মার লাশ আছে আর না আছে বাঁদীদের। জঙ্গলও নয় সেটা। একটা ঘরের মধ্যে চারপাইতে শুয়ে আছে সে। সামনে একটা গরু বাঁধা। কিছু মুরগী উঠোনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবং চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের একজন মেওয়াতী সামনে বসে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছে। আবার কান্না পেল মহ জমালের। সে মেওয়াতীর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে, "আমার মা কোথায়?" মেওয়াতিনী বলে, "সে মারা গেছে। তাকে গোর দেওয়া হয়েছে। তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি। কিছু খাবে? পায়েস তৈরি হয়েছে, খেয়ে নাও।"

মহ জমাল বলে, "খিদে পায়নি আমার।" তারপর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। মেওয়াতিনী কাছে এসে তাকে সান্ত্বনা দেয়, "বাছা, শান্ত হও। কাঁদলে কি হবে? তোর মা আর বেঁচে উঠবে না। আমাদের কোনো ছেলেপিলে নেই। মেয়ের মত রাখব তোকে। এ বাড়িটাকে নিজের বাড়ি ভেবে নে। কে তুই? তোর বাপ কোথায়? কোথায় যাচ্ছিলি?"

মহ জমাল বলে, "দিল্লীর বাদশার খানদানের মেয়ে আমি। আমার বাবামশায় মারা যান এগারো বছর আগে। আমরা বিদ্রোহের সময় পালাবার হিড়িকে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। নজফগড়ে আমাদের বাগানের মালী থাকে। তার বাড়ি যাবার ইচ্ছে ছিল আমাদের। পথে প্রথমে সেনাবাহিনীর সেপাইরা লুঠপাট করল তারপর গুজররা মা ও বাঁদীদের মেরে ফেলল।" বলতে বলতে আবার কাঁদতে শুরু করে।

কিছু দিন মহ জমাল মেওয়াতিনীর কাছে সুখে দিন কাটায়। যদিও বিগত দিনগুলি মনে করে মাঝে মধ্যে সে কাঁদত কিন্তু মেওয়াতিনীর ভালোবাসার দরুন তার কোনো দুঃখ-কষ্ট ছিল না। রান্না-বান্না কিছুই করতে হত না, তৈরি সেঁকা রুটি পেত। তবুও

জমালকে এ বাড়ি ও এর আটপৌরে ভাব যেন দাঁত বের করে কামড়াতে আসত আর পুরোনো দিনের জাঁকজমক মনে পড়ে যেত।

একদিন রাত্রে মহ জমাল, মেওয়াতিনী ও তার স্বামী বাড়িতে ঘুমোচ্ছিল। পড়শীর কুঁড়েতে আগুন লাগে আর সেখান থেকে এগিয়ে এদের চালাতেও আগুন ধরে যায়। ধোঁয়ার গন্ধে মহ জমালের ঘুম ভেঙে যায়, সে চীৎকার করে ওঠে। মেওয়াতী ও মেওয়াতিনী বাড়ির মধ্যে কিছু গয়নাগাঁটি রেখেছিল। তাই আনতে তারা ভিতরে ছোটে আর মহ জমাল ছোটে বাড়ির বাইরে। বাড়ির জলন্ত চালা হুড়মুড় করে ধসে পড়ে, তার মধ্যেই দুজন আগুনে পুড়ে মারা যায়। বস্তির লোকেরা অনেক কষ্টে আগুন নেভায়। কিন্তু মহ জমালের এই ঠিকানাও জলে-পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

বস্তির লোকেরা সকালবেলা পুড়ে মরা দুটো লাশকে গোর দিল। মহ জমালকে একজন মোড়ল তার বাড়ি নিয়ে গেল। তার ছিল দুটো বউ ও কয়েকটা বাচ্চা। মহ জমালকে শোবার জন্য একখানা চারপাই দেওয়া হল। সেদিন তো একরকম কেটে গেল। রাত্রে এক বউ বললে, "ওরে ছুকরী, দুধটা উনুনের উপর বসিয়ে দে।" অন্যজন বললে, "এদিকে আয় তো। আমার বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে দে।" একই সময়ে দু-দুটো হুকুম শুনে মহ জমাল ঘাবড়ে যায়। সে তো কখনো উনুনে দুধ বসায়নি না কখনো ঘুম-পাড়ানি গান গেয়ে বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়েছে। তবুও দুধের হাঁড়িটা তুলে উনুনের উপর রাখবার জন্য এগোয়। উনুনের কাছে এসে সে খায় হোঁচট, হাত থেকে হাঁড়ি পড়ে গিয়ে ভেঙে যায়। সমস্ত দুধ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শব্দ শুনে মোড়লের বউ ছুটে আসে এবং বয়ে যাওয়া দুধ দেখে মহ জমালকে জোড়াহাত মারে ও গালাগালি দিতে শুরু করে।

মার খাওয়া ও গালমন্দ শোনা তার জীবনে এই প্রথম। মহ জমাল দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপে। দুধ তার কাপড়েও পড়েছিল। কখনো সে নিজের কাপড়ের দিকে তাকায় কখনো মোড়লের বউএর দিকে যে তাকে একনাগাড়ে গাল পাড়ছিল।

শেষে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে সে জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করে। মহ জমালকে কাঁদতে দেখে মোড়ল বউয়ের রাগ চড়ে যায়, সে পায়ের জুতো খুলে মহ জমালের মুখের উপর দু-তিন ঘা মেরে বলে, "এবার তুই কান্নাকাটি করে আমাকে ভয় দেখাতে চাস? মড়ি ডাইনি কোথাকার। মেওয়াতিনীকে গিলেছিস। এখানে এবার কাকে গিলতে এসেছিস? সমস্ত দুধ আমার ফেলে দিয়েছিস। খোদা যেন আমার বাচ্চাদের ভাল রাখে, উনুনের সামনে দুধ পড়া বড় অলক্ষুণে। জানি না, তোর এখানে আসা আমাদের উপর কি বিপদ ডেকে আনবে।"

মহ জমালের মুখের উপর জুতো পড়ায় যন্ত্রণায় ছটফট করে ওঠে সে, দু হাত দিয়ে

মুখ ঢেকে নেয়। এই সময়ে এসে গেল মোড়ল। গোলমাল শুনে সেও সেখানে এগিয়ে গেল। মহ জমাল সেখান থেকে পালিয়ে নিজের চারপাইয়ের কাছে গেল। মোড়ল ও তার বউ এসে দঁাড়াল দালানে। বউকে মোড়ল জিজ্ঞেস করে, "কি ব্যাপার?" সে সমস্ত ঘটনা বলে। মোড়ল বলে, "ছ ড়ান দাও। গরীব মেয়েলোক। ভুল করে ফেলেছে। কিছু মনে করো না।" অন্য বউ বলে ওঠে, "এ গরীব নয়, কামচোর। একে বললাম বাচ্চাটাকে ঘুম পাড়িয়ে দে তো একবার সাড়া দিয়েই চুপ, যেন শোনেই নি কোনো কথা। একে তুমি বেগম বানিয়ে এনেছ না দাসী করে? যদি দাসী হয় তাহলে কাজ করতে হবে।" মোড়ল বলে, "আমি তো বেওয়ারিস বলে নিয়ে এসেছি। কাজ করা উচিত এর। আমাদের একটা চাকরানীর দরকারও ছিল।"

ভয়ে ভয়ে মহ জমাল বলে, "আজ পর্যন্ত আমি চাকরি কাকে বলে জানি না। আমাকে শিখিয়ে দাও। ভাগ্যের ফেরে এই দশায় পড়েছি। কিন্তু চাকরি করা কেউ শেখায়নি। আমার কাজ তো বাঁদীরা করত। আমি তো কোনো কাজই করিনি।" বলতে বলতে এমন কান্না পেল যে ও ফোঁপাতে শুরু করে।

মোড়ল বলে, "কাঁদিস না। ধীরে ধীরে সব কাজই শিখে ফেলবি।" তারপর সে মহ জমালকে কিছু খেতে দেয়। কিন্তু সে খেতে পারল না, না খেয়ে খালিপেটেই ঘুমিয়ে পড়ে। সকালবেলা মোড়লের বউ তাকে ধরে খুব জোরে ঝাঁকি দেয় ও বলে "আরে উঠছিস না কেন? কত ঘুমোবি? ঝাঁটপাট লাগাবার সময় হল।"

মহ জমালের মনে পড়ে যায় কীভাবে দিলশাদ, নরগিস, সুন্দরী তার ঘুম ভাঙাতো। সেও এক সময় ছিল আর এও এক সময়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে উঠে বসে ও পুরোনো দিনের অভ্যাসমত দু চার বার আড়ামোড়া ভাঙে।

মোড়লের বউ ঠেলা মেরে বলে, "যত সব অপয়া, ওঠবার নাম নেই।" তখন মহ জমাল বুঝতে পারে যে সে সত্যি দাসী হয়ে গেছে। শাহজাদী নেই আর। তখুনি উঠে পড়ে কিন্তু তার চোখ থেকে ক্রমাগত জল পড়েই যাচ্ছে। মোড়লের দ্বিতীয় বউ বলে, "এই মেয়েলোকটার এ বাড়িতে থাকা চলবে না। সব সময় চোখের জল ফেলছে। বাচ্চা-কাচ্চার বাড়িতে এই অপয়াকে রাখা ঠিক নয়।" এই মধ্যে মোড়ল এসে পৌঁছয় এবং বউদের তাড়া খেয়ে মহ জমালকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়।

মহ জমাল থতমত খেয়ে হতবুদ্ধি দাঁড়িয়ে থাকে। বলে, "হে আল্লা, কোথায় যাই?" হঠাৎ সেই সময় তার মনে পড়ে মালিনীর কথা। সেও এই এলাকায় থাকে। মা তার কাছে থাকার জন্য আসছিলেন।

মহ জমাল এইসব ভাবছিল এমন সময় কফনী পরা ফকির সামনে থেকে এসে মহ জমালকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল—তারপর দাঁড়িয়েই রইল। এই সাক্ষাতের প্রভাব

মহ জমালের উপর পড়ল অদ্ভুতভাবে এবং সেও বাক্‌শূন্য হয়ে গেল। যদিও সে এমন বিপদ ও কষ্টের মধ্যে পড়েছে যে নিজের শরীরের বিষয়ে তার কোনো হুঁশ নেই তবুও ফকির, তার কফনী ও লাল লাল চোখ দুটো তাকে এমন বিহ্বল করে তোলে যে সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

ফকির বলে, "মলিকা (মহারানী) আমার, এখানে কোথায় তুমি ?" 'মলিকা আমার' সম্বোধন শুনে মহ জমাল লজ্জায় মুখ অন্যদিকে করে বলে, "আমার ভাগ্যই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।" তারপর সে তাবৎ ঘটনা শোনায়। ফকির বলে, "আমার বাড়ি তো কাছেই কিন্তু আমি কখনো আপনার অবস্থার বিষয়ে শুনিনি। চলুন, আমার বাড়ি চলুন।"

মহ জমাল তার পিছনে পিছনে যায়। বাড়ি গিয়ে সে মহ জমালের বিষয়ে মালিনীকে বলে। মালিনী ছুটে এসে মহ জমালের পায়ের উপর আছড়ে পড়ে ও ভক্তের মত নিজেকে সমর্পিত করতে থাকে। তারপর অনেক সম্মান দেখিয়ে চারপাইতে বসিয়ে হালচাল জিজ্ঞেস করে ও বলে, "বেগম, এ বাড়ি আপনার। আমার ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। আপনার বাড়ির দৌলতেই আজ খোদা আমাকে সম্পন্ন অবস্থায় রেখেছেন। এবার আপনিই এ বাড়ির মালকিন। আমি ও আমার ছেলে আপনার গোলাম।"

মালিনী নিজের সামর্থ্য অনুসারে মহ জমালকে এত সুখে রাখে যে সে তার সব দুঃখ কষ্ট ভুলে যায়। সে দেখে মালিনীর ছেলের কাছে দূর দূর থেকে রুগী আসে। ফকির তার কফনীর উপর হাত ঘষে, নিজের দু'গালের উপর রাখে, চোখ দুটো কিছুক্ষণ বন্ধ রেখে খোলে ও বলে, 'যাও তুমি ভাল হয়ে গেছ' আর সব রুগীই দেখতে দেখতে ভাল হয়ে যায়।

মহ জমাল কদিন ধরে এই তামাশা দেখে তারপর সে মালিনীকে জিজ্ঞেস করে, "তোমার ছেলের মধ্যে এ শক্তি কোত্থেকে এল। আমাকেও একদিন ও এমনি করে ভাল করে দিয়েছিল।"

মালিনী হাতজোড় করে বলে, "বেগম যদি প্রাণভিক্ষার অভয় পাই তাহলে বলি।" মহ জমাল বলে, "এখন আর আমি প্রাণভিক্ষা দেওয়ার যোগ্য নই। তুমি বল, রহস্যটা কী, আমি জানতে চাই।"

মালিনী বলে, "বেগম, আমার ছেলে তোমার প্রেমে পড়ে এবং তোমার বিরহে সে অনেক কষ্ট ভোগ করে। শেষকালে একজন ফকির তাকে ঐ কফনীটা দেয়। এ তারই বিভূতি যা হাজার হাজার লোককে নিরাময় করছে এবং খোদা আপনাকেও এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনা থেকেই।"

এই কথার প্রভাব মহ্‌ জমালের উপর প্রবলভাবে পড়ে আর কিছুদিন পরে সে মালিনীকে বলে কাজীকে ডেকে পাঠায় ও কফনীআলার সঙ্গে বিয়ে করে নেয়।

মালিনী সারা জীবন মহ্‌ জমালের এমন সেবা-যত্ন করে এবং এত আদর-যত্নে রাখে যে মহ্‌ জমাল বলত যে তার ছোটবেলার কথাও আর মনে পড়ত না।

কিন্তু মালিনীর ছেলে কফনী পরা কখনো ছাড়েনি। সেই কফনীর নামডাক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আর এইভাবে মহ্‌ জমালের ঘুমন্ত ভাগ্যকে জাগিয়ে দেয় ঐ কফনীই।

6. সকীনা খানম

যে সময় নবাব ফৌলাদ খানের মৃতদেহ টিলার যুদ্ধস্থল থেকে বাড়ি এল সে সময় তার পুত্রবধূ প্রসব-পীড়ায় আক্রান্ত। সে সময় দিল্লীতে এমন কোনো বাড়ি ছিল না যেখানে বাড়ি থেকে পালিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়েনি। বাদশা বাহাদুরশার বিষয়ে সর্বসাধারণে এ কথা চাউর হয়ে গিয়েছিল যে তিনি লালকেল্লা থেকে বেরিয়ে হুমায়ুনের মকবরায় চলে গেছেন।

নবাব ফৌলাদ খান ছিলেন বনেদী আমীর। কিন্তু তাঁর বাবা মইনুদ্দীন আকবর শাহের দরবারে কোনো দোষে দোষী সাব্যস্ত হয়ে তাঁর প্রকোপে পড়েন। মন্সব ও জাগিরদারী খোয়ান। সে সময় ফৌলাদ খানের ছিল জোয়ান বয়েস, তিনি ইংরেজ সেনাদলে যোগ দেন। ফৌজে বিদ্রোহ হলে তিনিও ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে হয়ে যান। শেষদিন তিনি অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ইংরেজদের আক্রমণ করতে গেলেন। টিলার উপর ছিল ইংরেজদের ঘাঁটি। বেশ সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন তিনি কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা কামানের গোলার টুকরোর আঘাতে মারা যান। সেপাইরা তাঁর মৃতদেহ বাড়ি নিয়ে এসে দেখে যে তাঁর পুত্রবধূ প্রসব-পীড়ায় ছটফট করছে আর কোনো দাই পাওয়া যাচ্ছে না।

ফৌলাদ খানের জোয়ান ছেলে চারদিন আগে মারা যায়। বেচারী চারদিনের বিধবা। শাশুড়ি মারা গেছেন দুবছর হল। বাড়িতে শ্বশুর ছাড়া আর কোনো আত্মীয় স্বজন ছিল না। যখন তিনি রক্তে নেয়ে, চোখ বন্ধ করে মৃত্যুর ছায়া মুখের উপর নিয়ে বাড়ি এলেন তখন সকীনা খানমের চোখের সামনে আঁধার ঘনিয়ে এল।

বাড়িতে সবই ছিল। একটার জায়গায় চার চারজন দাসী ছিল খিদ্‌মৎ খাতিরের জন্য। কিন্তু মাথার উপর কারুর থাকাটা একেবারে আলাদা ব্যাপার। শ্বশুরের মৃত্যুর খবর শোনামাত্রই সকীনা খানম 'হায়' উচ্চারণ করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। মৃতদেহ উঠোনে পড়ে। সেপাইরা দরজায় দাঁড়িয়ে। সকীনা দালানে পালঙে অজ্ঞান। দুই দাসী সকীনার শিয়রে ও পায়ের কাছে নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে। তারা হতবুদ্ধি হয়ে গেছে এবং খোদার এই জুলুম দেখে তারস্বরে কাঁদছে।

অল্প একটু পরে সকীনা সংবিৎ ফিরে পায়। প্রসব বেদনায় ব্যাকুল হয়ে সে দাসীকে বলে, "যাও দেউড়িতে গিয়ে সেপাইকে বল কোনো দাই খুঁজে নিয়ে আসুক।" দাসী দৌড়ে দেউড়িতে যায় এবং হে হে হে হে শব্দ করতে করতে ছুটে ফিরে আসে, বলে, "বিবি, সেপাইদের গোরা খাকিরা। বিদ্রোহের সময় ইংরেজ সেপাইদের জনসাধারণ এই

নামেই ডাকত) ধরে নিয়ে যাচ্ছে আর এই গোরা খাকি উর্দিধারীরা আমাদের বাড়ির দিকে আসছে।" সকীনা বলে, "মড়ি, দরজা তো বন্ধ করে আয়।" দাসী গিয়ে দরজা বন্ধ করে আসে। এবার ব্যথা বাড়ল ও সকীনার একটি ছেলে হল। কাছে না কোনো দাই, না কোনো জিনিসপত্র। খোদা নিজেই মুশকিল আসান করে দিলেন। কিন্তু সকীনা এই ধকলের চোটে আবার জ্ঞান হারাল। দাসী তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে নাওয়ালো আর কাপড় জড়িয়ে কোলে নিল।

সকীনার বয়স ছিল সতেরো বছর। মাত্র সোয়া বছর হল বিয়ে হয়েছে। তার বাপের বাড়ি ফরুকাবাদে আর সে রয়েছে দিল্লীতে যেখানে চলছে বিদ্রোহের হাঙ্গামা। জ্ঞান ফিরে এলে সে দাসীকে বলে, "আমাকে একটু সাহায্য কর। উঠিয়ে বসিয়ে দাও।" দাসী বলে, "বেটি, এমন কাণ্ড করো না। শুয়ে থাক এখন। তোমার বসবার শক্তি কই এখনো?" সকীনা বলে, "তোবা কর পিসী, আরামের কথা ভাবার সময় নয় এটা। না জানি কিস্মতে আরও কি কি আছে।"

এ কথা শুনে দাসী মাথার তলায় হাত দিয়ে সকীনাকে বসিয়ে দেয় ও কোমরের কাছে কোলবালিশ রেখে দেয়। সকীনা প্রথমে নিজের বাচ্চাকে মমতাভরা চোখে দেখে যা তার দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় মনস্কাম আর তার ইচ্ছে হল সে নির্নিমেষ তার দিকে চেয়েই থাকে। কিন্তু সহসা সে লজ্জিত হয়ে শিশুর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয় যেন। উঠোনের দিকে তাকানোমাত্রই চোখে পড়ে ফৌলাদ খানের মৃতদেহ। তার উল্লাসে লাগে এক প্রচণ্ড ধাক্কা, সে হয়ে ওঠে ব্যাকুল আর বুঝমান হওয়া সত্ত্বেও সে উল্টোপাল্টা বকবক করতে শুরু করে। সে বলতে থাকে :

"দেখে নিন আপনার অনাথ নাতিকে। যার জন্য অনেক আশা করে বসেছিলেন সে জন্মেছে। এর বাবাকে কোলে তুলে কবরে শুইয়ে দিয়েছিলেন। একেও কোলে নিয়ে কবরে ঘুমিয়ে পড়ুন। একে আমি এই অবস্থায় কেমন করে কোথায় রাখব? এই পুঁচকে অতিথি জানে না, যে ঘরে সে এসেছে তারা কত বিপদগ্রস্ত। দিল্লীতে আপনিই ছিলেন আমার বাবা। আজ আপনিও মারা গেলেন। ফরুকাবাদে আমার বাবা আছেন কিন্তু জীবিত থাকা সত্ত্বেও আমার সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটেছে। এই ছেলেটার বাপ আমার সংসার গুলজার করে রেখেছিল। তাকেও মেরে ফেলল একটা গুলি।"

এই সব বলার পর সকীনার হঠাৎ কিছু মনে পড়ে। হৃদয়ের লুকোনো এক বেদনায় কাতর হয়ে সে বাঁ হাত বুকের উপর রাখে ও ডান হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বালিশে ঠেস দিয়ে কাঁদতে শুরু করে আর কাঁদতে কাঁদতে সে আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

একজন দাসী সকীনাকে অজ্ঞান অবস্থায় ছেড়ে দরজা খুলে বাইরে বেরোয় এই উদ্দেশ্যে যে কাউকে ডেকে যদি ফৌলাদ খানকে গোর দেওয়ার বন্দোবস্ত করা যায়।

কিন্তু সারা গলি নির্জন থমথমে। একটিও লোক রাস্তায় চলছে না দেখে সে ইশারায় অন্য দাসীকে ডাকে ও বলে, "পিসী, আপন প্রাণ বাঁচাও। চল এখান থেকে পালিয়ে যাই। বিবির সঙ্গে থাকলে মিছিমিছি প্রাণটা যাবে।"

সে বলে, "এমন দুঃসময়ে মালিককে ছেড়ে গিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচানো খুবই নিমকহারামের মত কাজ হবে এবং অবস্থা যখন এমন যে একটি অসহায় শিশু সঙ্গে রয়েছে।" প্রথম দাসী জবাব দেয়,"তুমি কি পাগল? কার বিশ্বস্ততা ? কার ভালোবাসা? প্রাণে বাঁচলেই সব কিছু। আমি তো যাচ্ছি। তুই যা বুঝিস কর। খাকিরা (ইংরেজ সেপাই) এখুনি এসে পড়বে। বাড়ি লুঠ করবে ও আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে।" এ কথা শুনে অন্য দাসীটাও হয়ে উঠল কঠোর। সে তৃতীয় ও চতুর্থ দাসীকে ইশারায় কাছে ডাকলে। তারাও পালাবার জন্য তৈরী হল। "পালাচ্ছিই যখন তখন কিছু টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে নাও। সকীনা তো বেহুঁশ পড়ে। চাবি শিয়র থেকে নিয়ে সিন্দুকটা কুঠরি থেকে বের করে পালানো যাক।"

যার কোলে বাচ্চা ছিল সে দয়ার্দ্র হয়ে বলে, "একে কে রাখবে?" একজন বলে. "যার কাছে শুইয়ে দে।" সে বলে, "না পিসী, আমি ওকে সঙ্গে নিয়ে যাব।" সবাই একস্বরে বলে ওঠে, "শুভান আল্লা, নিজের প্রাণ বাঁচানো দায়, বাচ্চা সামলাবি কি করে ? বাচ্চা না থাকলে সকীনা ছটফটিয়ে মারা যাবে। তোর কি একটুও দয়া-মায়া নেই ?" সেও জবাব দিলে, "তোমরা সকীনাকে ছেড়ে যাচ্ছ, ওর জন্য তোমাদের মনে কি কোনো দয়ামায়া নেই ? এই সোনার চাঁদকে কেন নিয়ে যাব না ? আমার মেয়েকে গিয়ে দেব, সে একে মানুষ করবে। তার বাচ্চা এই কিছুদিন হল মারা গেছে। এখানে ছেড়ে গেলে সকীনা তো মরবেই, বাচ্চাটাও মরবে।"

শেষ পর্যন্ত চারজনই নগদ টাকার সিন্দুক ও বাচ্চাটাকে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয় ও নিজের নিজের বাড়ি চলে যায়—ছেড়ে যায় সকীনাকে সেই বাড়িতে যেখানে একটি মৃতদেহ ছাড়া আর কোনো প্রাণী ছিল না।

প্রসবের দরুন সকীনা খুবই কাহিল ও বিব্রত হয়ে পড়েছিল। চার ঘণ্টা বেহুঁশ পড়ে ছিল সে। রাত আটটায় যখন তার জ্ঞান ফিরল তখন বাড়িতে চারিদিকে অন্ধকার। সে চোখ মেলে চারিদিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে। যখন কিছুই দেখা গেল না সে ভাবল যে সে মারা গেছে আর এ অন্ধকার কবরের। আচমকা তার মুখ থেকে কলমা বেরিয়ে এল, সে বলতে শুরু করে,"ইসলাম আমার ধর্ম, মোহম্মদ আমার রসুল। খোদাই আমার মালিক যে একক এবং তার মত আর কেউ নেই। হে আল্লা, তোবা। আমি নির্দোষ। আমার কবর আঁধারে রেখ না, আমাকে জন্নতের (স্বর্গ) আলো দাও।"

অল্প কিছুক্ষণ পরে সে আকাশে তারা দেখতে পেল আর বুঝতে পারল যে সে জীবিত

আর পালঙে শুয়ে আছে। তখন সে দাসীদের ডাকতে শুরু করে। যখন কেউই সাড়া দিল না তখন সে ভীষণ ঘাবড়ে গেল। উঠে বসলো। হয় তার দুর্বলতা ছিল না বা হতে পারে একথা তার মনেই রইল না যে সে দুর্বল। পালঙ থেকে নেমে আলো জ্বালিয়ে দেখে যে বাড়িতে কোনো লোক নেই। উঠোনে শ্বশুরের মৃতদেহ। এ ছাড়া কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

রাত্রে লাশ দেখে সে ভয় পেয়ে যায় ও চেঁচাতে শুরু করে। পাড়ায় কোনো লোক থাকলে তার চিৎকার শুনে ভিতরে আসত। কিন্তু পাড়ার সবাই আগেই পালিয়েছে। চেঁচাতে চেঁচাতে সকীনা এত ভয় পেয়ে যায় যে তার বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পায় আর মেঝের উপর তেওড়া হয়ে আছড়ে পড়ে। আবার সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। সকালবেলা পর্যন্ত তার মূর্ছা ভাঙ্গে না। সে মেঝের উপর পড়ে থাকে। বেলা বাড়লে সে চোখ খোলে। সে সময় সে বুকে বল ফিরে পায়, যদিও দুবেলা সে কিছু খায়নি. কারণ দুঃখ ও ভয় বিপদ-কালে মানুষকে শক্ত-সমর্থ করে তোলে। তাছাড়া সৈনিক-বংশে প্রতিপালিত হওয়ার দরুন তার মন সাধারণ মেয়েদের মত দুর্বল ছিল না। সে ভাবলো মৃতদেহটা গোর দেওয়ার বন্দোবস্ত করা যাক কেন না খিদেয় তার গা এলিয়ে পড়ছিল। হঠাৎ তার মনে এল, বাচ্চা কই? এ কথা মনে পড়া মাত্র তার বুক মাতৃত্বের বেদনায় ডুকরে উঠল এবং সে পাগলের মত দৌড়ে দৌড়ে সমস্ত বাড়ি খুঁজে বেড়াতে লাগল। যখন বাচ্চা কোথাও পাওয়া গেল না তখন সে জলের বড় বড় জালার ঢাকনা খুলে তার মধ্যে উঁকি দেয় যদি বাচ্চাটা তার মধ্যে থাকে। পালঙ থেকে বালিশ তুলে বুকে চেপে চেপে ধরে।

শেষ পর্যন্ত বিপদই আবার বুকে বল জোগায়। বুকে বল পাওয়ায় মনে কিছুটা স্থির-রতা এল, সে বাচ্চার কথা ভুলে গেল। আলমারি খুলে সে একটি শাদা চাদর বের করে ও শহীদের মৃতদেহকে তাই দিয়ে ঢেকে দেয়। তারপর প্রার্থনা করার আসন বিছিয়ে সিজদায় মাথা নত করে কেঁদে কেঁদে বলে:

"হে খোদা, তোমারই এক বান্দার লাশ পড়ে আছে যে না কফন পেল না দফন (গোর)। তার নসীব, না তো সে কবর পেল, না পেল নামাজ। তোমার ফরিস্তাদের (দেবদূত) পাঠিয়ে দাও, তারা নামাজ পড়ুক এবং তোমার করুণার মাঝে তাকে সমাধিস্থ করে দিক। আমার সঙ্গে ছল করলো সবাই, আমার সম্রাটও চলে গেল আন-দুনিয়ায়। আমার খোকাকেও কেউ ছিনিয়ে নিয়ে গেল। এখন তুমি ছাড়া আমার রক্ষক নেই। আমি অসহায়, আমার সেলাম স্বীকার কর আর আমার হাত ধর।"

সকীনা খানম তখনও প্রণামের ভঙ্গিমায় আনত যখন দরজা খুলে খাকি উর্দি পরা চারজন সেপাই ভিতরে প্রবেশ করে। সকীনা তৎক্ষণাৎ মাথা তোলে এবং পরপুরুষদের

আসতে দেখে মুখ চাদর দিয়ে ঢেকে নেয়। ভয় পেয়ে কোণে লুকোতে চাইলো কিন্তু সেপাইরা ততক্ষণে ভিতরে এসে গেছে। তারা সকীনাকে ধরে ফেলে ও মুখ খুলে দেখে সবাই এক সঙ্গে বলে ওঠে, "জোয়ান মেয়ে, এ তো যুবতী ও খুবই সুন্দরী।"

এরপর তারা সকীনাকে ছেড়ে দিল ও সারা বাড়ীতে তল্লাসী করতে লাগল। নগদ টাকা তো দাসীরা নিয়ে গিয়েছিল। কিছু গয়না গাঁটি ও দামী কাপড়-চোপড় লুঠ করল তারা। আঙিনায় লাশের উপর থেকে চাদর সরিয়ে বলে ওঠে, "আরে, এ তো কোনো দাগী বিদ্রোহী।"

তারপর সেপাইরা সকীনাকে হাত ধরে ওঠায় ও তাদের সঙ্গে যেতে বলে। সকীনা কিছু বলল না। সেপাইদের জোর-জবরদস্তিতে নাচার হয়ে উঠে দাঁড়ায়। সে বলতে পারে না যে সে সদ্য-প্রসূতা। সে এও বলতে পারে না যে সে ক্ষুধার্ত। তার মুখ দিয়ে এও বের হয় না, বিরক্ত করো না। এ দুনিয়ায় তার কেউ নেই। তার বনেদিয়ানা, ভদ্রতা ও আত্মসম্মান তাকে বাধা দেয় কিছু বলতে।

সেপাইরা তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যায়। যখন দরজার কাছে পৌছয় সকীনা পিছন ফিরে বাড়ির দিকে তাকায় ও দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "বিদায় তোমায়, হে শ্বশুরবাড়ি, কফন ও কবর থেকে বঞ্চিত শ্বশুরকে সেলাম। আমি তলোয়ারধারীদের ঘরের বউ। তাঁরা যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তাঁদের ইজ্জৎ-আবরুর জন্য প্রাণ দিতেন " সকীনার এই করুণ কথা শুনে সেপাইরা হাসে আর তাকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে যায়। কিছুদূর সকীনা চুপচাপ চলে। তারপর বলে, "আমি সদ্য-প্রসূতা। আমি ক্ষুধার্ত। করুণা কর আমার উপর। আমিও তোমাদের দেশের। তোমাদেরই ধর্মাবলম্বী। আমি নির্দোষ।"

এই শুনে চারজন সেপাই দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর অনুকম্পাভরা স্বরে বলে, "ঘাবড়াস-নি! তোর জন্য কোনো যান-বাহন যোগাড় করছি।" এই বলে তিনজন দাঁড়াল, এক-জন গিয়ে আহতদের বইবার গাড়ি নিয়ে এল এবং তাতে সকীনাকে বসিয়ে টিলার উপর ক্যাম্পে নিয়ে গেল।

কেউ জানে না বিদ্রোহকালীন প্রসূতি সকীনার বারো বছর কেমন করে কাটে, কোথায় কোথায় সে ছিল আর কোন কোন বিপদের মোকাবিলা করতে হয়েছে তাকে। আমি যখন তাকে দেখি তখন সে রোহতকের এক পাড়ায় ভিক্ষা চাইছিল। তার পায়ে জুতো ছিল না। তার পায়জামা ছেঁড়া, কোর্তা খুবই ময়লা ও কয়েক জায়গায় তালি মারা। মাথা ঢাকার দোপাট্টা ছিঁড়ে ন্যাতার মত হয়ে গেছে। মনে হয় অনেক দিন খায়নি। গায়ের চামড়া হাড়ের গায়ে বসে গেছে। চোখের পাশে কালো গভীর বৃত্ত। মাথার চুল উস্কোখুস্কো। মুখে সৌন্দর্য রয়েছে কিন্তু লুণ্ঠিত। চোখে খোদার দেওয়া শোভা

কিন্তু বিধ্বস্ত ও সন্তপ্ত। হাঁটতে গিয়ে মাথা ঘোরে, সে দেওয়াল ধরে মাথা নিচু করে নেয়। চলতে গিয়ে পা নড়বড় করলে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে সে হাঁক ছাড়ে তারপর এগোয়।

কিছুদূর গিয়ে একটা বাড়ি। সেখানে বিয়ে। শ'য়ে শ'য়ে লোক নেমন্তন্ন খেয়ে বেরিয়ে আসছে। সেখানে সে দাঁড়ায় তারপর আর্তস্বরে আওড়ায়, "অন্তরীক্ষের দ্বারা উৎপীড়িত আমি। বড় ঘরে জন্ম আমার। ইজ্জৎ খুইয়ে লাজ-শরম বিসর্জন দিয়ে রুটি খেতে এসেছি। আপনাদের কল্যাণ হোক সাহেব, আমাকেও দুটো খেতে দাও। এক গরাস আমাকেও দাও।"

সকীনার আওয়াজ ফকিরদের গণ্ডগোলে কেউ শুনতে পায় না উপরন্তু একটা চাকর যে বিয়ের বন্দোবস্তে ব্যস্ত ছিল এমন এক ধাক্কা দিল যে সে চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। পড়-বার সময় অসহায় নারী কাৎরে ওঠে, "তিন দিন থেকে আমি কিছু খাইনি। আমাকে মারিস না—কিস্মতই আমাকে মেরে রেখেছে। হে খোদা, কোথায় যাই। কাকে শোনাই আমার দুঃখ।" এই বলে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। একটি ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমস্তই দেখছিল। সকীনার দশা দেখে তার মনে করুণা জেগে ওঠে ও সেও অসহায়ভাবে কাঁদতে শুরু করে। সে গিয়ে হাত ধরে সকীনাকে ওঠায় আর বলে, "এসো, আমার সঙ্গে এসো। আমি তোমাকে খেতে দেব।"

সকীনা অতি কষ্টে ছেলেটার উপর ভর দিয়ে ওঠে। ছেলেটা কাছেপিঠের একটি বাড়িতে চাকর। সে তাকে সেখানে নিয়ে যায় এবং বিয়ে-বাড়ি থেকে আনা নিজের ভাগের খাবার তার সামনে ধরে। সকীনা দু গরাস খেয়ে জল খায়। চোখের অন্ধকার কেটে গেল। ছেলেটিকে হাজার হাজার আশীর্বাদ দিতে থাকে সে।

ভালোভাবে ছেলেটিকে লক্ষ্য করা মাত্রই তার বুক কেমন করে ওঠে আর সে ছেলে-টিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। ছেলেটিও সকীনার বাহুপাশে কি রকম ব্যাকুল হয়ে উঠল। সকীনা জিজ্ঞেস করে, "কার ছেলে তুই?" সে বলে, "আমার মা এই বাড়ির দাসী আর আমিও এখানে চাকর।" সকীনা জিজ্ঞেস করে, "তোমার মা কোথায়?" ছেলেটা জবাব দেয়, "সে আর দিদিমা দুজনেই চৌধুরানীর সঙ্গে বিয়েতে গেছে।" চৌধুরানীর বাড়িরই চাকর তারা।

শুনে সকীনা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু সে ভাবছিল এই ছেলেটার উপর তার এত টান কেন? এ কথা সত্যি যে সে দয়া করেছে কিন্তু কেউ দয়া করলেই মানুষের মন তো এত ব্যাকুল হয়ে ওঠে না!

ইতিমধ্যে ছেলেটির মা ও দিদিমা বাড়ি ফিরে এলো। সকীনা অবিলম্বে চিনে ফেলল —ছেলেটির দিদিমা সেই দাসী যে বিদ্রোহের সময় তার ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে-

ছিল। দাসী সকীনাকে চিনতে পারল না। কিন্তু সকীনা তার নাম ধরে ডাকায় নিজের নাম ও অবস্থার কথা বলায় দাসী তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল।

ছেলেটা যখন জানতে পারল যে সে আদতে সকীনারই ছেলে তখন সে আবার মাকে জড়িয়ে কাঁদতে লাগল। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে সকীনা আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, "হে পরমাত্মা তুমি ধন্য। মৌলা, তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, বিদ্রোহের সময় আমার সোনাকে বাঁচিয়ে রেখেছ আর আবার বারো বছর পরে কুঁজীর দিন পালটালো।"

এরপর সকীনা ফরুকাবাদে তার বাপের বাড়িতে চিঠি পাঠায়। সেখানে মা-বাবা তখন মারা গেছেন। তিন ভাই বেঁচে। তারা রোহতক এসে তাদের বোন ও ভাগনেকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। দাসী ও তার মেয়ে অর্থাৎ যারা ছেলেকে পালন-পোষণ করেছিল তারাও সঙ্গে যায়। ফরুকাবাদ পৌঁছে তারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন কাটাতে থাকে।

7. হরিৎ-বসনা

দিল্লীর সেই সব বৃদ্ধ যাঁরা 1857-র বিদ্রোহের সময় যুবক ছিলেন সাধারণত গল্প করেন, যে সময় ইংরেজ সৈন্য টিলার উপর ঘাঁটি তৈরি করেছিল আর কাশ্মীরী দরোয়াজার দিক থেকে দিল্লী শহরের উপর গুলিগোলা চালাত সে সময় সবুজ পোশাক পরা একজন মুসলমান বৃদ্ধা শহরের বাজারে গিয়ে উঁচু আর গুরুগম্ভীর স্বরে বলত, "এসো চলো খোদা তোমাদের জন্নতে (স্বর্গে) ডেকেছেন।"

শহরবাসীরা এই ডাক শুনে চারিদিকে জড়ো হত আর তাদের সবাইকে নিয়ে সে কাশ্মীরী দরোয়াজার উপর আক্রমণ করত, তারপর শহরবাসীদের সঙ্গে নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি যুদ্ধ চালাত।

কিছু লোক, যারা এই ঘটনা নিজের চোখে দেখেছে, বলে, সে নারী অসমসাহসী ও নির্ভীক ছিল। মৃত্যুর ভয় মোটেই ছিল না তার। গুলি-গোলার বৃষ্টির মধ্যে সে বাহাদুর সেপাইদের মত এগিয়ে যেত। কখনো সে পদাতিকা, কখনো অশ্বারোহিণী। তার কাছে থাকত বন্দুক তলোয়ার ও একটি পতাকা। বন্দুক সে খুব ভাল চালাত। যারা তার সঙ্গে ঘাঁটিতে গিয়েছে তাদের মধ্যে একজন বলে, সে তলোয়ার চালাতেও খুব দক্ষ ছিল। কতবার দেখা গেছে সে সৈনিকদের সঙ্গে সামনা-সামনি বা মুখোমুখি তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করছে।

সেই নারীর বীরত্ব ও নির্ভীকতা দেখে শহরের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠত এবং এগিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করত। যেহেতু যুদ্ধ করার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না তাদের তাই প্রায়ই তাদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে হত। আর যখন তারা পালাত তখন এই নারী তাদের বাধা দিত কিন্তু বাধ্য হয়ে তাকেও ফিরে আসতে হত। ফিরে এলেও কেউ জানতে পারত না সে কোথায় যায় আর কোত্থেকে আসে।

এইভাবে শেষপর্যন্ত একদিন এমন হল যে উত্তেজনা ও উন্মাদনায় আক্রমণ চালাতে চালাতে বন্দুকের গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ও তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে সে ঘাঁটি পর্যন্ত পৌঁছে গেল ও সেখানে ঘায়েল হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। ইংরেজ সৈনিকরা তাকে গ্রেফ্‌তার করে নেয়। তারপর কেউ জানে না সে কোথায় গেল এবং তার হল কী ?

দিল্লী প্রদেশের সরকার কিছু ইংরেজী পত্র প্রকাশিত করেছে যা দিল্লী ঘেরাও করার সময় ইংরেজ সামরিক অফিসাররা লিখেছিল। এইসব চিঠিপত্রের মধ্যে একটা চিঠি

লেফ্‌টেনান্ট ডবলু. এস. আর হাডসন সাহেবের যা তিনি দিল্লী ক্যাম্প থেকে 29 জুলাই 1857 তারিখে মিষ্টার জে. গিলসন ফরসাইথ, ডেপুটি কমিশনার আম্বালাকে পাঠিয়েছিলেন। এই চিঠিতে ঐ মুসলমান বৃদ্ধার বিষয়ে কিছু তথ্য দেওয়া আছে। পত্রের মন্তব্য কিছু এই ধরনের ঃ

মাই ডিয়ার ফরসাইথ। তোমার কাছে একজন মুসলমান বৃদ্ধাকে পাঠাচ্ছি। অদ্ভুত ধরনের নারী। সবুজ রঙের পোশাক পরে লোকদের বিদ্রোহ করার জন্য উত্তেজিত করত আর নিজেই হাতিয়ার নিয়ে তাদের নেতৃত্ব করে ঘাঁটির উপর আক্রমণ করত।

যে সব সৈনিকের সঙ্গে ওর মোকাবিলা হয়েছে তারা বলে যে সে কয়েকবার সাহস ও বীরত্বের সঙ্গে আক্রমণ করে বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে হাতিয়ার চালায় আর ওর শক্তি পাঁচটি পুরুষের সমান।

যে দিন তাকে গ্রেপ্তার করা হয় সেদিন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সে শহরের বিদ্রোহীদের সৈনিক কায়দায় লড়াচ্ছিল। তার বন্দুক দিয়ে সে অনেককে তাক করে করে মারে। সৈনিকরা বলে যে সে নিজেই বন্দুক ও তলোয়ারের আঘাতে আমাদের অনেক লোককে হতাহত করেছে কিন্তু যা আমরা ভেবেছিলাম তাই হলো—তার সঙ্গীরা সব পালিয়ে যায় আর সে আহত হয়ে গ্রেপ্তার হয়। জেনেরাল সাহেবের সামনে পেশ করা হলে তিনি ওকে নারী ভেবে মুক্ত করে দেওয়ার আদেশ দেন। কিন্তু আমি তাঁকে নিরস্ত করি, বলি, যদি একে মুক্তি দেওয়া হয় তাহলে এ শহরে ফিরে গিয়ে নিজের দৈবীশক্তির বিষয়ে ঘোষণা করবে এবং অন্ধ বিশ্বাসের বেড়াজালে বাঁধা লোকেরা এর মুক্তি কোনো দৈবশক্তির পরিণাম বলে মেনে নেবে ফলত হতে পারে ছাড়া পাওয়ার দরুন এই নারী ফ্রান্সের সেই বিখ্যাত নারীর মত আমাদের জন্য জটিল সমস্যার সৃষ্টি করবে—ফরাসী বিদ্রোহের ইতিহাসে যার উল্লেখ আছে। (ফ্রান্সে বিদ্রোহের সময় জোন অফ আর্ক নামক নারী এইভাবেই শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করত। হাজার হাজার লোক তাকে দৈবশক্তির প্রতীক মেনে নিয়ে তার পক্ষ নেওয়াতে দারুণ যুদ্ধ ও রক্তপাত হয়। জনসাধারণ ভাবত, এ নারী কখনো মরবে না। শেষে ফ্রান্সের বিরোধী দলের সেনারা তাকে জীবন্ত দগ্ধ করে। তবেই উপদ্রব শান্ত হয়। সেই নারীর সংকেত পত্রে করা হয়েছে—হসন নিজামী।)

জেনেরাল সাহেব আমার কথা মেনে নিলেন এবং স্ত্রীলোকটিকে বন্দী করার আদেশ দিলেন। স্ত্রীলোকটিকে আপনার কাছে তাই পাঠানো হচ্ছে। আশা করি আপনি একে কয়েদ করে রাখার সমুচিত ব্যবস্থা করবেন কেননা এ ডাইনি ভীষণ বিপজ্জনক —হাডসন।

৪. বাহাদুর শাহ জফর

আমার স্বর্গীয়া মা তাঁর পূজনীয় পিতামহাশয় হজরৎ শাহ গুলাম হসন সাহেবের কাছ থেকে শোনা গল্প আমাকে বলেছিলেন। যেদিন বাহাদুর শাহ দিল্লীর কেল্লা থেকে বের হন তিনি সোজা হজরৎ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগায় গিয়ে হাজির হলেন। সে সময় বাদশা বিচিত্র ভয় ও নিরাশায় আচ্ছন্ন। কয়েকটি বাছাই করা খোজা ও খোলা পালকির বেহারা ছাড়া কোনো লোক তাঁর সঙ্গে ছিল না। ভয়ে চিন্তায় বাদশার মুখ মলিন ও তাঁর শাদা দাড়িতে ধুলো মাটি। বাদশার আসার খবর পেয়ে দাদামশাই দরগা শরীফে এলেন। দেখেন মঙ্গলময় সমাধির শিয়রের দিকের দরজায় ঠেস দিয়ে তিনি বসে আছেন। বরাবরের মত আমাকে দেখামাত্রই তাঁর মুখ স্মিত হয়ে উঠল। তারপর বললেন, "আমি তোমাকে গোড়াতেই বলেছি এই অলপ্পেয়ে বিদ্রোহী সেপাইরা বড্ড বড়ফটাই করে আর তাদের বিশ্বাস করা বড ভুল। নিজেরাও ডুববে, আমাকেও ডোবাবে। শেষ পর্যন্ত তাই হল। মায়ামোহ ত্যাগ করে যদিও ফকিরের মত পালিয়ে এসেছি তবু আমি সেই রক্তের স্মৃতি বহন করছি যা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মোকাবিলা করতে ভয় পায় না। আমার বাপ-ঠাকুরদারা এর চেয়ে খারাপ সময় দেখেছে কিন্তু তারা সাহস হারায়নি। কিন্তু আমাকে নেপথ্য থেকেই যবনিকা দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে হিন্দুস্থানের সিংহাসনে আমিই তৈমুরের শেষ চিহ্ন। মোগল শাসনের বাতি নিভু-নিভু, আর কয়েক ঘণ্টার ওয়াস্তা মাত্র। অতএব জেনে শুনে অযথা রক্তপাত করি কেন? এইজন্য কেল্লা ছেড়ে চলে এসেছি। মুলুক খোদার, যাকে ইচ্ছে দিন। শত শত বছর ধরে আমাদের বংশ হিন্দুস্থানে হিম্মতের সঙ্গে প্রভুত্ব করেছে। এখন এসেছে অন্যদের সময়। তারা শাসন করবে, লোকে তাদের বাদশা বলবে। আর আমাদের বলবে—ওদের হাতে পরাজিত। এ আপশোষের কথা নয়। আমরাও অন্যদের ঘর নিশ্চিহ্ন করে নিজেদের ঘর তৈরি করেছিলাম।" এইসব নিরাশাভরা কথা বলার পর বাদশা একটা ছোট সিন্দুক দিলেন আমাকে আর বললেন, এই নাও, এ তোমার হাতে সঁপে দিচ্ছি। আমীর তৈমুর যখন কুস্তুনতুনিয়া (কনস্ট্যান্টিনোপল) জয় করেন তখন সুলতান জলদরম বায়জীদের কোষাগার থেকে এই অমূল্য বস্তুটি পেয়েছিলেন। এতে হুজুর হজরৎ মোহম্মদের কল্যাণকারী দাড়ির পাঁচটি চুল আছে যা আজ পর্যন্ত আমাদের বংশে একটি পবিত্র ও অমূল্য উপহাররূপে রক্ষিত হয়ে এসেছে। এখন আমার মর্ত্ত বা পাতাল

কোথাও ঠাঁই নেই। এটা নিয়ে কোথায় যাবো ? এখন আপনি এর প্রকৃত অধিকারী। নিন, এটা রেখে দিন। এ আমার হৃদয় ও চোখকে স্নিগ্ধ করে রাখত, আজকের এই ভয়ানক বিপদে নিজের থেকে একে হারাচ্ছি।

দাদামশাই সিন্দুকটা নিয়ে নিলেন। দরগা শরীফের তোষাখানায় রেখে দিলেন সেটা। আজও তা সেখানে রয়েছে। অন্যান্য বহুমূল্য ও পবিত্র বস্তুর মত প্রতি বছর সন হিজরীর তৃতীয় মাসে শ্রদ্ধালু ব্যক্তিদের দর্শন করতে দেওয়া হয়।

দাদামশাইকে বাদশা বললেন আজ তিন বেলা হল খাওয়া-দাওয়ার সুযোগ পাইনি। যদি বাড়িতে কিছু তৈরি থাকে, এনে দাও। দাদামশাই বললেন, তাঁরাও মৃত্যুর উপ-কূলে দাঁড়িয়ে। রান্না করার খেয়ালই নেই। বাড়ি যাচ্ছি। যা কিছু আছে হাজির করছি। বরঞ্চ আপনিই চলুন না। যতক্ষণ আমি জীবিত আছি এবং আমার সন্তানরা বেঁচে ততক্ষণ কোনো লোক আপনার গায়ে হাত দিতে পারবে না। আমরা মরে যাওয়ার পরই আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে।

বাদশা বলেন, "আপনি যা বলেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ কিন্তু এই বুড়ো হাড় বাঁচাবার জন্য পীরের সন্তানদের মৃত্যু মুখে ফেলে দিতে পারি না। আপনার দর্শন পেলাম, আমানৎ গচ্ছিত রাখলাম, এবার দু গরাস খেয়ে নিয়ে হুমায়ুনের সমাধির দিকে রওনা হব। সেখানে যা ভাগ্যে লেখা আছে তাই হবে।"

দাদামশাই বাড়ি এসে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো খাবার তৈরি আছে কি ? বলা হল, বেসনের রুটি ও সির্কার চাটনি আছে। অগত্যা তাই একটা খোয়ানে (কাপড় দিয়ে ঢাকা বড় থালা) সাজিয়ে নিয়ে আসা হল। বাদশা ছোলার রুটি খেয়ে তিন বেলা পরে জল খেলেন এবং খোদাকে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর হুমায়ুনের সমাধিতে পৌঁছে গ্রেপ্তার হলেন। তাঁকে রেঙ্গুন পাঠিয়ে দেওয়া হল। রেঙ্গুনেও বাদশার দরবেশী জীবন একটুও বদলায়নি। যতদিন জীবিত ছিলেন একজন আত্মতুষ্ট আল্লার উপর নির্ভরশীল দরবেশের মতন জীবন কাটিয়ে গেলেন।

9. মির্জা নসীর-উল-মুল্ক

এই হল দিল্লী যাকে হিন্দুস্থানের হৃদয় ও শাসনের রাজধানী বলা হয়। দিল্লী জমজমাট ছিল যখন লালকেল্লায় মোগলদের শেষ বাতি টিমটিম করছিল। আর যখন মাথার উপর বিপদ নেমে এল এর বাসিন্দাদেরও আচার-ব্যবহার বদলে গেল।

যখন হাকিমদের চালচলন বদলাল, জনতাও হয়ে উঠল দুরাচারী। ফলে রাজা ও প্রজা দুইই বরবাদ হয়ে গেল। উদাহরণ আছে হাজার হাজার, কিন্তু আমি একটি শিক্ষাপ্রদ কাহিনী শুনিয়ে হিন্দুস্থানের নিবাসীদের বিশেষ করে মুসলমান ও সুফিদের (সাধু-সন্ত) মধ্যে খোদার ভয় জাগাতে চাই।

(1) বিদ্রোহের বছরখানেক আগে দিল্লীর বাইরে কয়েকটি শাহজাদা শিকার খেলে বেড়াচ্ছিল। ছোট ছোট পাখী ও ঘুঘু দুপুরের রোদ থেকে বাঁচবার জন্য গাছের সরু-সরু সবুজ ডালে ভগবানের চিন্তায় মশগুল হয়ে বসে থাকত। তাদের এরা গুলতি মারছিল। সামনে থেকে তালি মারা জোব্বা পরা এক ফকির এসে পড়ল। সে সসম্মান শাহজাদাদের সেলাম করে বলে, "মিয়াঁ সাহেবজাদা, এই বোবা প্রাণীদের কেন কষ্ট দিচ্ছ? এরা তোমার কি ক্ষতি করেছে? এদেরও প্রাণ আছে, এরাও তোমাদেরই মতন দুঃখ-কষ্ট অনুভব করে কিন্তু নাচার কেননা মুখে কিছুই বলতে পারে না। তোমরা বাদশার সন্তান। বাদশাদের উচিত নিজের দেশের বাসিন্দাদের স্নেহ করা ও ভালবাসা। এই প্রাণীরাও দেশে বাস করে। এদের প্রতি ন্যায় ও করুণার আচরণ করলে বাদশার মর্যাদা বাড়বে।"

আঠারো বছর বয়সের বড় শাহজাদা লজ্জা পেয়ে গুলতি রেখে দেয়। কিন্তু ছোট শাহজাদা মির্জা নসীর-উল-মুল্ক রেগে গিয়ে বলে, "যা যা, তু কড়ির মুরোদ নেই আমাদের উপদেশ দিতে এসেছে। কে রে তুই আমাদের উপদেশ দিচ্ছিস? শিকার-টিকার তো সবাই করে। আমরা করেছি তো কোন অপরাধ করেছি?"

ফকির বলে, "সাহবে আলম (বাদশার প্রতি সম্বোধন) রাগ করবেন না, শিকার এমন প্রাণীর করুন যাতে একটার প্রাণ গেলে দশ-পাঁচজনের পেট ভরে। এই খুদে খুদে পাখী মেরে কি পাওয়া যাবে? কুড়িটা মারলেও একটা লোকের পেট ভরবে না।" ফকির আবার বলায় মির্জা নসীর চটে যায় আর গুলতি দিয়ে ফকিরের হাঁটুতে এত জোরে মারে যে সে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। তার মুখ দিয়ে আচমকা বেরিয়ে যায়, "উঃ ঠ্যাং ভেঙে দিল।"

ফকির মাটিতে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাহজাদারা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে কেল্লার দিকে চলে যায় আর ফকির ঘসটাতে ঘসটাতে সামনের গোরস্থানের দিকে এগোয়। ঘসটে ঘসটে চলার সময় বলতে থাকে, "সে সিংহাসন কেমন করে টিঁকবে যার মালিক এত নিষ্ঠুর। ওরে ছোঁড়া তুই আমার ঠ্যাং ভেঙ্গে দিলি। খোদা তোরও ঠ্যাং ভাঙ্গুন এবং তুইও এমনি দুঃখ কষ্ট ভোগ কর।

(2) কামান গর্জায় ও গোলার বর্ষণ হয়। চারিদিকে মাটিতে পড়ে থাকা গাদা গাদা লাশ দেখতে পাওয়া যায়। দিল্লী শহর জনবিরল, খাঁ খাঁ করে। দেখা যায় সেই শাহজাদারা লালকেল্লা থেকে ঘোড়ায় চড়ে হন্তদন্ত হয়ে পাহাড়গঞ্জের দিকে যাচ্ছে। অন্যদিক থেকে বিশ-পঁচিশ জন গোরা সেপাই আক্রমণ করতে ছুটে আসছে। তারা কমবয়সী এই সওয়ারদের উপর হঠাৎ গুলি চালায়। গুলির ঝাঁক ঘোড়া ও সওয়ারদের ঝাঁঝরা করে দেয়, শাহজাদারা রক্তাক্ত মাটিতে পড়ে ছটফট করতে থাকে। গোরারা কাছে এসে দেখে দুজন শাহজাদা মারা গেছে কিন্তু একজনের তখনো শ্বাস-প্রশ্বাস চলছে। একজন সেপাই শাহজাদার হাত ধরে তাকে দাঁড় করায়। দেখা যায় কোথাও তার আঘাত লাগেনি। ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ায় মামুলিভাব ছড়ে গেছে। ভয়ের চোটে সে মূর্ছা গেছে। জ্যান্ত দেখে ঘোড়ার রাশ দিয়ে হাত বেঁধে দেওয়া হয় ও তাকে বন্দী করে দুজন সেপাইর সঙ্গে ক্যাম্পে পাঠানো হয়। ক্যাম্প ছিল টিলার উপর। গোরা সেপাইদের সঙ্গে কালা সেপাইরাও ছিল সেখানে। বড় সাহেব যখন জানতে পারে যে এ হল বাদশার নাতি নসীর-উল-মুল্ক, খুব খুশী হয়ে সে হুকুম দেয়, একে খুব যত্ন করে রাখ।

(3) বিদ্রোহী সেনা হেরে পালাতে শুরু করে ও ইংরেজদের সেনা ধেয়ে আক্রমণ করে শহরে ঢুকে পড়ে। বাহাদুর শাহ হুমায়ুনের মকবরায় গ্রেফ্‌তার হলেন। তৈমুরী বংশের বাতি দপদপিয়ে নিভে গেল। খালি মাথা ও পরদাবিহীন মুখ খুলে ভদ্র শাহজাদীরা জঙ্গল আবাদ করতে শুরু করে। বাপ তার সন্তানের সম্মুখে খুন হয় আর মায়েরা তাদের জোয়ান ছেলেদের মাটিতে লুটিয়ে পড়তে দেখে চেঁচাতে থাকে।

এই রকম অবস্থায় টিলার ক্যাম্পে মির্জা নসীর-উল-মুল্ক দড়িতে বাঁধা বসেছিলেন। একজন পাঠান সেপাই দৌড়ে এসে বলে, "আমি আপনার খালাসের জন্য সাহেবের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এসেছি। শীগ্‌গির পালান। নইলে অন্য কোনো বিপদে পড়তে পারেন।"

বেচারা মির্জার পায়ে হাঁটার অভ্যাস নেই। ভাবছে কি করি? কিন্তু মৃত্যুর মুখোমুখি পড়লে মানুষ কী না করে। পাঠানকে ধন্যবাদ দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে, জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যায়। চলতেই থাকে কিন্তু জানে না কোথায় যাচ্ছে। মাইলখানেক চলার

পর পায়ে ফোস্কা পড়ে। জিভ শুকনো। গলায় যেন কাঁটা বিঁধছে। ক্লান্ত হয়ে একটা গাছের ছায়ায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে। চোখ জলে ভরে আসে। আকাশের দিকে তাকায়, হায় আল্লা এ কী বিপদ ঘনিয়ে এল মাথার উপর। কোথায় যাই, কি ঠিকানা আমাদের? উপরে চোখ ওঠাতে গাছের উপর দৃষ্টি পড়ে। সেখানে দেখে একটি নীড় যাতে এক কপোতী আরামে তার ডিমের উপর বসে। তার স্বাধীনতা ও সুখ দেখে শাহজাদার খুব ঈর্ষা হয়, বলে "কপোত, তুই আমার চেয়ে লক্ষগুণ ভালো, সুখে নিজের বাসায় নিশ্চিন্ত বসে আছিস। আমার জন্য আজ না ভুঁয়ে, না আসমানে, কোথাও ঠাঁই নেই।

10. মির্জা দিলদার শাহ

মির্জা দিলদার শাহ বয়ান করতেন যে যখন হজরৎ বাহাদুর শা'র ছেলে মির্জা মুগল ও অন্য শাহজাদাদের গুলি মেরে হত্যা করার পর তাদের মাথা কেটে তাঁর সামনে আনা হল, তখন বারকোশে কাটামুণ্ড দেখে বাদশা অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে বললেন, "অলহমদোলিল্লাহ (ভগবানের আশীর্বাদ) সার্থক হয়ে সামনে এলে। পুরুষ এই দিনের জন্যই সন্তান পালন করে।"

যে মহাশয় খবর এনেছিলেন তিনি বলেন, "হ্যাঁ মশাই, সেপাই বিদ্রোহের সময় আপনার বয়স কত ছিল ?" মির্জা দিলদার শাহ বলেন, "এই চৌদ্দ-পনেরো বছর হবে-'খন। সমস্ত ঘটনাই আমার ভালো করে মনে আছে। বাবাজান আমাকে নিয়ে গাজিয়াবাদ যাচ্ছিলেন। হিণ্ডন নদীর উপর সৈন্যরা আমাদের ধরে ফেলল। মা ও আমার ছোট বোন চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে। বাবা তাদের থামালেন ও চোখ বাঁচিয়ে একজন সেপাইয়ের তলোয়ার উঠিয়ে নিলেন। তলোয়ার হাতে নিতেই চারদিক থেকে সেপাইরা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দু'চারজনকে তিনি ঘায়েল করলেন কিন্তু সঙীন ও তলোয়ারের এন্তার আঘাতে তিনি খণ্ড খণ্ড হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শহীদ হলেন।

"তাঁর শহীদ হয়ে যাওয়ার পর সেপাইরা আমার মা ও বোনের কান ছিঁড়ে নেয় আর তাদের কাছে যা কিছু ছিল কেড়ে নেয়। আমাকে তারা বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে গেল।

"যে সময় আমাকে মার কাছ থেকে আলাদা করা হল তাঁর চিৎকারে আকাশ দুলে উঠল। বুকে হাত দিয়ে চিৎকার করে তিনি বলেছিলেন—ওরে আমার মানিককে ছেড়ে দে তোরা। আমার স্বামীকে তো তোরা মেরেই ফেললি। এবার অনাথের উপর তো একটু দয়া কর। আমার বৈধব্য আমি কার ভরসায় কাটাব ? আল্লা, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আমার বুকের ধন যায় কোথায় ? কেউ গিয়ে আকবর ও শাজাহানকে কবর থেকে ডেকে আনুক এবং তার বংশের দুঃখিনীর দুর্গতির কথা শোনাক। দেখে যাও আমার কলিজার টুকরোকে ওরা মুঠোয় পিষে ফেলছে। ওরে তোরা কেউ আয়। আমার কোলের বাছাকে দিয়ে দে আমায়।

"আমার ছোট বোন দাদা বলে আমার দিকে ছুটে আসে। কিন্তু সেপাইরা ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়ে যায়। আমাকে ঘোড়ার রাশ দিয়ে বাঁধে। ঘোড়া ছোটে, আমিও ছুটি। পা রক্তাক্ত, বুক ধড়ফড় করছে আর দম আটকে আসছে।"

জিজ্ঞেস করি, "মির্জা, একটা কথা রয়ে গেল। তোমার মা ও বোনের কি হল?" মির্জা বলে, "আজ পর্যন্ত তাদের কোনো পাত্তা পাইনি। জানিনা তাদের কি পোয়াতে হয়েছে আর তারা কোথায় গেল? আমাকে সেপাইরা তাদের সঙ্গে দিল্লী নিয়ে আসে। সেখান থেকে ইন্দের নিয়ে যায়। আমাকে দিয়ে তারা ঘোড়ার দলাই-মলাই করাতো আর নাদ পরিষ্কার করাতো।"

11. মির্জা কমর সুলতান

দিল্লীর জামা মসজিদ থেকে যে রাস্তা মটিয়া মহল ও চিতলী কবর হয়ে দিল্লী দরোয়াজার দিকে গেছে সেখানে আছে কল্লু খবাস কী হবেলী নামে একটি পাড়া। প্রতি রাত্রে অন্ধকার নেমে আসার পর এই পাড়া থেকে একজন ফকির বেরিয়ে জামা মসজিদ পর্যন্ত যায়। তারপর সেখান থেকে ফিরে আসে।

এই ফকির বেশ ঢ্যাঙ্গা, রোগা-পটকা শরীর, আধপাকা দাড়ি, চুল শাদা ও গাল তোবড়ানো, চোখে দেখতে পায় না। ময়লা তালিমারা পায়জামা। পায়ে ছেঁড়া জুতো ন্যাতার মত। কুর্তা খুবই ময়লা। তাতেও দশ-বারো জায়গায় তালি মারা। মাথায় লম্বা চুল কিন্তু উস্কু-খুস্কু। একটা ছেঁড়া টুপি মাথায়। ফকিরের এক হাতে বাঁশের একটা লাঠি আর অন্য হাতে মাটির পেয়ালা একটা, যার কানা একদিকে ভাঙা। মুখটা এতই ফ্যাকাশে যে চেহারা দেখে মনে হয় ফকির হয় চণ্ডু সেবন করেছে নয়তো কয়েক মাস পরে আজই বিছানা থেকে উঠেছে। যখন চলে তখন ডান পাটা ঘসটে ঘসটে এগোয়। বোধহয় কখনো পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়েছিল।

তার কণ্ঠস্বর খুবই উঁচু ও বেদনাভরা। যখন সে হতাশ গলায় উঁচু আওয়াজে আওড়ায় "আল্লা এক পয়সার আটা দে। তুই-ই দিবি।" তখন বাজারের লোকজন ও বাজারের কাছে-পিঠের বাড়ির লোকেরা স্বতই প্রভাবিত হয়ে পড়ে। যদিও তাদের মধ্যে দু-চারজন ছাড়া কেউ জানে না এ ফকির কে আর এর স্বরে এত বেদনা কেন ঝরে। কয়েক বাড়ির মেয়েরা বলতে আরম্ভ করেছে, সন্ধ্যে হল যেই ঐ অলক্ষুণে আওয়াজ কানে আসবেই। যখনই এ আওয়াও শুনি আমার বুক ফেটে যায়। জানি না কে এ ফকির, হামেশা রাতেই ভিক্ষে চাইতে বেরোয়, দিনের বেলা কখনো এর আওয়াজ তো শোনা যায় না।

ফকির যখন কল্লু খবাস কী হবেলী থেকে বাজারে আসে তখন সোজা জামা মসজিদের দিকে লাঠিতে ভর দিয়ে ডান পা টেনে টেনে ছেঁড়া জুতোয় ধুলো উড়িয়ে আস্তে আস্তে যায়। এক এক মিনিট অন্তর একটিই কথা তার মুখ থেকে বের হয়, "আল্লা, এক পয়সার আটা দে।"

ফকির কোনো দোকান বা লোকের সামনে দাঁড়ায় না। সোজা চলতে থাকে। যদি কোনো পথিক বা দোকানদারের মনে করুণা জেগে ওঠে আর সে ফকিরের পেয়ালায়

পয়সা বা আটা বা কোনো খাবার দেয় তাহলে ফকির শুধু এইটুকু বলে, "তোমার ভাল হোক বাবা, খোদা যেন তোমাকে খারাপ সময় না দেখান." তারপর এগিয়ে যায়। অন্ধ হওয়ার দরুন সে দেখতে পায় না ভিক্ষা দিল কে।

জামা মসজিদ থেকে ফেরার পথে এই জিগির দিতে দিতে সে কল্লু খবাস কী হবেলীতে পৌঁছে যায়। এই হবেলীতে গরীব মুসলমানদের অনেকগুলো আলাদা আলাদা ছোট ছোট বাড়ি আছে। এই বাড়িগুলোর মধ্যেই খুবই ছোট্ট ভাঙাচোরা গোছের একটি বাড়ি এই ফকিরের। বাড়ি ফিরে এসে দরজার শিকল খুলে সে ভেতরে যায়। এই বাড়িতে শুধু একটা দালান একটা কুঠরী, একটা পায়খানা আর একটা ছোট্ট উঠোন। দালানে একটা ভাঙা চারপাই আর মেঝেতে একটা ছেঁড়া কম্বল পাতা।

দিল্লীআলারা জানেই না, কে এই ফকির? শুধু দু চারজনই জানে যে সে বাদশা বাহাদুর শা'র পৌত্র এবং তার নাম মির্জা কমর সুলতান। বিদ্রোহের আগে সে ছিল সুন্দর যুবক এবং কেল্লায় তার সৌন্দর্য ও লম্বা গড়নের খুব জাঁক ছিল। ঘোড়ায় চড়ে যখন সে বেরোত তখন কেল্লার মেয়েরা ও দিল্লীর বাজারের লোকেরা পথ চলতে চলতে থমকে যেত। তার সৌন্দর্য চোখ ভরে দেখত। সবাই নুয়ে প'ড়ে তাকে সেলাম করত।

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, "মির্জা, তুমি দিনের বেলা বাইরে কেন বের হও না?" শাহজাদা কমর সুলতান জবাব দেন, "এককালে যে বাজারে আমার রূপ ও জমকালো যানবাহনের জাঁকজমক ছিল সেই বাজারে এই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় দিনের বেলা বেরোতে লজ্জা করে। সেইজন্য রাতে বাইরে বেরুই এবং শুধু খোদার কাছে চাই এবং তারই সামনে হাত পাতি।"

কেউ একজন বলে, "মির্জা, আফিঙের অভ্যাস আছে নাকি?" শাহজাদা কমর সুলতান জবাব দেয়, "আজ্ঞে হাঁ্যা, খারাপ সংসর্গে পড়ে আফিঙের বদভ্যাস হয়েছে আর কখনো কখনো চণ্ডুও টানি।"

কখনো কেউ জিজ্ঞেস করে "বিদ্রোহের সময় থেকে আজ পর্যন্ত কিভাবে কাটালে? এর বৃত্তান্ত শোনাও না কিছু।" এ শুনে কমর সুলতান একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ হয়ে যেত এবং কিছুক্ষণ পরে বলত, "সে কথা আর বলো না, স্বপ্ন দেখছিলাম, হঠাৎ চোখ খুলে গেল। এখন জাগছি এবং সে স্বপ্ন আর কখনো দেখা হল না—দেখতে পাওয়ার আশাও নেই।"

Printed at Shri Avtar Printing Press, Nirankari Colony, Delhi-110009